সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

এপ্রিল ২০১৬

ড. বি আর আম্বেদকর

ভারতের সংবিধান প্রণেতা

উপরে

১. ১৩ মার্চ ২০১৬: হাই কমিশনার হর্ষবর্ধন শ্রিংলার সঙ্গে বাংলাদেশের অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতের সৌজন্য সাক্ষাৎ

২. ১৬ মার্চ ২০১৬ হাই কমিশনার হর্ষবর্ধন শ্রিংলার সঙ্গে বাংলাদেশের সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় মন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের সৌজন্য সাক্ষাৎ

নিচে

১. ২১ মার্চ ২০১৬ হাই কমিশনার হর্ষবর্ধন শ্রিংলার সঙ্গে বাংলাদেশের নৌ-পরিবহন মন্ত্রী শাজাহান খানের সৌজন্য সাক্ষাৎ

২. ২৩ মার্চ ২০১৬ হাই কমিশনার হর্ষবর্ধন শ্রিংলার সঙ্গে বাংলাদেশের পরিবেশ ও বন মন্ত্রী আনোয়ার হোসেন মঞ্জুর সৌজন্য সাক্ষাৎ

সৌহার্দ সম্প্রীতি ও মৈত্রীর সেতুবন্ধ

ভারত বিচিত্রা

বর্ষ চুয়াল্লিশ | সংখ্যা ০৩ | ফাল্গুন-চৈত্র ১৪২২ | এপ্রিল ২০১৬

www.hcidhaka.gov.in
Facebook page: /IndiaInBangladesh; @ihcdhaka
IGCC Facebook page: /IndiraGandhiCulturalCentre

Bharat Bichitra
Facebook page: /BharatBichitra

‘বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা মেটাতে সহযোগিতা করতে পেরে আমরা আনন্দিত’
পৃষ্ঠা: ০৫

সূ চি প ত্র

কর্মযোগ	বাংলাদেশকে ভারতের শুভেচ্ছা এবং অন্যান্য ০৪
শ্রদ্ধাঞ্জলি	ভীমরাও রামজি আম্বেদকর ০৮ ড. ভীমরাও আম্বেদকর: জীবন ও সময় ॥ নরেন্দ্র যাদব ১২ বিশ্লেষণী ক্ষমতার অধিকারী পরিকল্পনাবিদ ॥ নরেন্দ্র যাদব ১৬
মাইলফলক	ভারতীয় সংবিধান ॥ সুমন্ত বাত্রা ১৯
অনুবাদ গল্প	গৃহপরিচারিকা ॥ অনিতা দেশাই ৩৬
কবিতা	কাজী রোজী ॥ রোকসানা আফরীন ॥ কনকরঞ্জন দাস ॥ অরুণ সেন ২৪ শেলী সেনগুপ্তা ॥ কাজী নাসিম আহমেদ ॥ রনি অধিকারী ॥ সাথী দাশ ॥ পঙ্কজ সাহা ২৫
ধারাবাহিক	বিগফুট কি সত্যিই আছে? ॥ নাসরীন মুস্তাফা ২৬ রূপকথা ভূতকথা ভালবাসা ॥ সালেহা চৌধুরী ৪১
সৌহার্দ	ভারতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি ৩১
ছোটগল্প	উত্তম পুরুষে প্রেমের গল্প ॥ মশিউল আলম ৩২ ভাদু নক্ষত্র ॥ অনিন্দিতা গোস্বামী ৪৬
প্রবন্ধ	অমলিন প্রেম পারিজাত ॥ আমিরুল আলম খান ২২ বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥ মৃদুলা ভট্টাচার্য ৪৩
শেষ পাতা	বর্ধমান মহাবীর ॥ নিজস্ব প্রতিবেদন ৪৮

০৮ থেকে ২১

ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকর

শ্র দ্ধা ঞ্জ লি

অনুসারীদের মাঝে বাবা সাহেব আম্বেদকর নামে সম্মোধিত ভারতরত্ন ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকর নিঃসন্দেহে ভারতের অন্যতম উজ্জ্বল সন্তান। তিনি ১৯২০-র দশকে ভারতের সামাজিক-রাজনৈতিক দৃশ্যপটে প্রবেশ করেন এবং ব্রিটিশ শাসনাবসানের চূড়ান্ত দশকগুলোতে ভারতের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক রূপান্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৭ সালে ভারতে ব্রিটিশ শাসনাবসানের পর স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার দায়িত্ব তাঁর ওপর বর্তায়। আম্বেদকর ছিলেন এক মহান সমাজ সংস্কারক, মানবাধিকার প্রবক্তা এবং ভারতের দলিত সমাজের মুক্তিদাতা।

সম্পাদক নান্টু রায়
ফোন ৯৮৫০১৯৩-৭, ৯৮৮৮৭৮৯-৯১ এক্স: ১৪৯
ফ্যাক্স ৮৮-০২-৯৮৮২৫৫৫
e-mail: informa@hcidhaka.gov.in

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ভারতীয় হাই কমিশন
বাড়ি নং ২ সড়ক নং ১৪২ গুলশান-১ ঢাকা-১২১২

শিল্প নির্দেশক ধ্রুব এষ
গ্রাফিক্স মো. রেদওয়ানুর রহমান

মুদ্রণ ডটনেট লিমিটেড
৫১/৫১এ পুরানা পল্টন ঢাকা-১০০০ ফোন ৯৫৬২১৯৮

ভারতীয় জনগণের শুভেচ্ছাসহ বিনামূল্যে বিতরিত ভারত বিচিত্রায় প্রকাশিত সব রচনার মতামত লেখকের নিজস্ব– এর সঙ্গে ভারত সরকারের কোন যোগ নেই
এই পত্রিকার কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণের ক্ষেত্রে ঋণস্বীকার বাঞ্ছনীয়

পাঠকের পাতা

অবস্থানগত কারণে এলাকার মধ্যে এই কলেজটি অনার্স ও মাস্টার্স কলেজ হিসেবে এলাকাবাসীর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনার গুরুত্বপূর্ণ সম্পাদকীয়সহ বিভিন্ন খ্যাতিমান লেখকের রচনাসমৃদ্ধ *ভারত বিচিত্রা* নিয়মিতভাবে কলেজ গ্রন্থাগারে ছাত্র-ছাত্রীরা পেলে তাদের সৃজনশীলতা ও উৎসাহ বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে। এ বিবেচনায় নিয়মিতভাবে অত্র কলেজের গ্রন্থাগারে ভারত বিচিত্রা পত্রিকাটি পাঠালে থাকব।

বাবুলচন্দ্র সাহা
গ্রন্থাগারিক
ফেনী সরকারি কলেজ, ফেনী

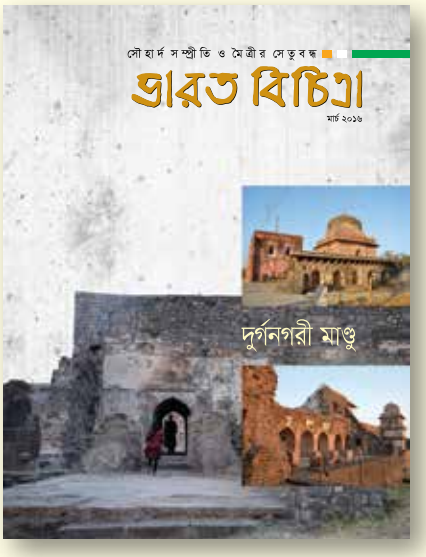

নিয়মিত প্রেরণের অনুরোধ

শিক্ষাবিদ মুহিবুর রহমান চৌধুরী স্মৃতি পাঠাগার হবিগঞ্জ জেলার নবীগঞ্জ উপজেলার অজ পাড়াগাঁয়ের অহংকার। পাঠাগারে বর্তমানে বইয়ের সংখ্যা তিন হাজারের অধিক। এই পাঠাগারে ইতিহাস-ঐতিহ্য, বিজ্ঞানসমৃদ্ধ বইসহ বাংলাদেশ ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশের পত্র-পত্রিকা এবং ম্যাগাজিন সংগ্রহ অব্যাহত রয়েছে। প্রতি বছর ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে পাঠাগারের পক্ষ থেকে *বর্ণমালা* নামে ছোট কাগজ প্রকাশ করা হয় এবং ১৬ ডিসেম্বর মহান বিজয় দিবস উপলক্ষ্যে বের করা হয় *বিজয় নিশান*। এছাড়াও পাঠাগারের পক্ষ থেকে সাহিত্য-সংস্কৃতি ও ইতিহাস-ঐতিহ্যবিষয়ক পত্রিকা *মাসিক নবীগঞ্জ দর্পণ* প্রকাশিত হচ্ছে। প্রতিদিন অগণিত পাঠক পাঠাগারে বই ও পত্রিকা পড়তে ভিড় জমায়।

আমরা পাঠাগারের পক্ষ থেকে ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা থেকে প্রকাশিত বহুল প্রচারিত ও তথ্যবহুল মাসিক পত্রিকা *ভারত বিচিত্রা* ও অন্যান্য প্রকাশনা প্রেরণের বিনীত অনুরোধ জানাই। এর ফলে শিক্ষাবিদ মুহিবুর রহমান চৌধুরী স্মৃতি পাঠাগার সমৃদ্ধ হবে বলে আমরা মনে করি।

এম গৌছুজ্জামান চৌধুরী
প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি
শিক্ষাবিদ মুহিবুর রহমান চৌধুরী স্মৃতি পাঠাগার
কসবা (ফরহাদপুর), ডাকঘর: লিপাইগঞ্জ ৩৩৭৪
নবীগঞ্জ, হবিগঞ্জ

বহুগুণে বৃদ্ধি পাবে

স্বাধীনতার মাসে রক্তিম শুভেচ্ছা। আমি ফেনী সরকারি কলেজে লাইব্রেরিয়ান হিসেবে কর্মরত। ফেনী সরকারি কলেজে প্রায় ১৭,০০০ (সতেরো) হাজার ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নরত আছে। কলেজের গ্রন্থাগারটি খুবই সমৃদ্ধ। তদুপরি,

সংযুক্ত থাকতে পারি

আমাদের প্রতিষ্ঠান নোয়াগাঁও আদর্শ ক্লাব অত্র এলাকার একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান। এছাড়া আমরা নোয়াগাঁও হাফিজিয়া মাদ্রাসা নামে একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছি। এখানে সমৃদ্ধ একটি লাইব্রেরি আছে। আমরা এর জন্য নিয়মিত *ভারত বিচিত্রা* আশা করছি যাতে আমরা বিশাল ভারতের সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, ঐতিহ্যের সঙ্গে সংযুক্ত থাকতে পারি।

তাই কর্তৃপক্ষের কাছে আমাদের আবেদন, আমাদের নাম নতুন গ্রাহক তালিকাভুক্ত করে *ভারত বিচিত্রা* পড়ার সুযোগদানে বাধিত করুন।

ডা. আরিফুর রহমান খান
প্রযত্নে ওসমান আলী খান
মুসলিম খানের বাড়ী
হোল্ডিং-৩৩/১, ওয়ার্ড-০৭, দাউদপুর ইউনিয়ন,
রূপগঞ্জ উপজেলা, পোস্ট-জিরাব
জেলা-নারায়ণগঞ্জ-১৭২০

স্কুলজীবন থেকে

ভারত-বিচিত্রা নভেম্বর ২০১৫ সংখ্যার মাধ্যমে জানতে পারলাম, *ভারত-বিচিত্রা*র নতুন গ্রাহক হিসেবে তালিকাভুক্ত হওয়ার সুযোগ রয়েছে। এখানে বিনীতভাবে উল্লেখ করতে চাই, স্কুলজীবন থেকে *ভারত বিচিত্রা* পড়ে আসছি। বাংলাদেশ ডাক বিভাগে বর্তমানে আমার কর্মজীবন। পত্রিকাটি আমার হাত দিয়েই গ্রাহকগণের কাছে পৌঁছয়। আমি তাদের কাছ থেকে চেয়ে পড়ি। পড়ার স্বাদ পাই কিন্তু এত সুন্দর পত্রিকাটি সংগ্রহে রাখতে পারি না।

তাই নতুন গ্রাহক হিসেবে তালিকাভুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

অরুণ দেবনাথ
পোস্টাল অপারেটর
কিশোরগঞ্জ প্রধান ডাকঘর
কিশোরগঞ্জ ২৩০০

লোভে পড়েছি

ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত মানিকনগর আইডিয়েল বি এম কলেজটি একটি সমৃদ্ধ কলেজ। এ কলেজের লাইব্রেরিতে ভারত বিচিত্রার মত একটি তথ্যবহুল পত্রিকা পাঠালে শুধু লাইব্রেরি নয়, শিক্ষক-ছাত্রছাত্রীরাও সমৃদ্ধ হবেন। বন্ধু সায়েম মাহবুবের আলোচনায় পত্রিকাটি সম্পর্কে শুনে রীতিমত লোভে পড়েছি।

মাঈন উদ্দিন ভূঁইয়া অধ্যক্ষ
মানিকনগর আইডিয়েল বিএম কলেজ
মানিকনগর, ঢাকা

মুগ্ধ পাঠক

আমি দিনাজপুর জেলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত 'দিনাজপুর একাডেমি' দিনাজপুর এর সিনিয়র সহকারী শিক্ষক। আমি *ভারত-বিচিত্রা*র একজন মুগ্ধ পাঠক কিন্তু পত্রিকাটি নিয়মিত পড়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। পত্রিকাটি বিভিন্নভাবে সংগ্রহ করে পড়তে হয় যা খুবই কষ্টকর। পত্রিকাটি পড়ে ভারতের সাহিত্য, শিল্প-সংস্কৃতি, ছবি, দর্শনীয় স্থান, মহৎ ব্যক্তিদের জীবনীর বিশদ বর্ণনা থাকে যা পড়ে আমরা জ্ঞানার্জন করতে পারি। আশা করি *ভারত-বিচিত্রা*র সদস্য করে সৌজন্য কপি পাঠিয়ে পড়ার সুযোগ দিয়ে কৃতজ্ঞ করবেন।

মো: নূর ইসলাম
সিনিয়র সহকারী শিক্ষক
দিনাজপুর একাডেমি, দিনাজপুর
নিমতলা, দিনাজপুর-৫২০০

সম্পাদকীয়

নববর্ষ উদ্‌যাপনের মধ্যে সব দেশের সব জাতির মত বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতির পরিচয় পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। চৈত্রের দাবদাহ দিয়ে যাত্রা শুরু করে ছয়টি ঋতুর লীলাবৈচিত্র্যে কখনও রূপমাধুরী কখনও বৈরাগ্য দেখতে দেখতে বছর কেটে যায়। এর মাঝে দেখা দেয় নানা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, খরা, অতিবৃষ্টি; সমাজ ও জাতীয় জীবনে নৈরাজ্য আর হতাশাও মাঝে মাঝে জায়গা করে নেয়। কিন্তু সেগুলিই সব নয়। কর্মপ্রেরণা আর কর্মোদ্যোগে জেগে ওঠা নবীন আকাঙ্ক্ষার বলিষ্ঠ প্রকাশও তো নতুন বছরে দেখা যায়। পুরাতন বছরের গ্লানি থেকে শিক্ষা আর প্রেরণা নিয়ে সার্থক হয়ে ওঠে জীবনের প্রয়াস। কোন কিছুই নিরর্থক নয়, হারিয়ে যাওয়া নয়। বৈশাখী মুকুল যেমন নবীন আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে দেখা দেয়, তেমনই চৈত্রশেষের ঝরাপাতাও রেখে যায় বিগত বছরের স্মৃতি আর স্বাক্ষর।

বাঙালির একান্ত নিজস্ব বৈশাখী মেলা আর হালখাতা অনুষ্ঠানের সূচনা তো নতুন বছরের শুভারম্ভেই। পুরনো বছরের ধারদেনা, কায়-কারবারের পাওনা-গণ্ডার হিসেব-নিকেশ শুরু হয় হালখাতার উৎসবকে কেন্দ্র করেই।

গ্রামে-গঞ্জে নগরে-বন্দরে বৈশাখী মেলার আয়োজন চলে নানাভাবে। শুধু তো মেলা নয়, বৈশাখের আবাহনে আকর্ষণীয় নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান, বইয়ের প্রকাশনা উৎসব– সবকিছুর মধ্যে নাগরিকমন যেন খুঁজে ফেরে নতুন বছর শুরু করার প্রেরণা। ভোরের আলো ফুটতেই বৈশাখী গানে গানে পথে পথে মানুষের ঢল নামে। একে-অপরের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতে পরিপূর্ণ হতে থাকে প্রাণের মিলন। ছুটির দিনটিকে আরও নিবিড় আরও সার্থক করে তোলার বাসনায় পারিবারিক পরিমণ্ডলও সাধ্যমত আনন্দঘন ও উৎসবমুখর করে তোলার প্রয়াস চলে সকলে মিলে।

এপ্রিলকে যদিও ইংরেজ কবি 'ক্রুয়েলেস্ট মান্‌থ' বলেছেন, কিন্তু এ মাসেই ভারতজুড়ে চলে নতুন বছর উদ্‌যাপনের হিড়িক। ভারতের নতুন বছরে আজ থেকে একশো পঁচিশ বছর আগে ১৮৯১ খ্রিস্টাব্দের ১৪ এপ্রিল ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন ভারতরত্ন বি আর আম্বেদকর, অনুসারীরা যাঁকে 'বাবাসাহেব' বলে সম্বোধন করত। তিনি ছিলেন একাধারে উচ্চমানের ব্যবহারশাস্ত্রবিদ, রাজনৈতিক নেতা, বৌদ্ধ পুনর্জাগরণবাদী, দার্শনিক, চিন্তাবিদ, নৃতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক, বাগ্মী, বিশিষ্ট লেখক, অর্থনীতিবিদ, পণ্ডিত, সম্পাদক, রাষ্ট্রবিপ্লবী এবং সর্বোপরি ভারতের সংবিধান রচয়িতা। তিনি জাতীয়তাবাদী, তিনি ভারতের দলিত অধিকার আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা।

চলতি সংখ্যায় আমরা ড. বি আর আম্বেদকরের ওপর বেশ কয়েকটি রচনা পত্রস্থ করেছি। এসব রচনায় এই কৃতবিদ্য মানুষটির জীবন ও কর্মের ওপর আলোকপাতের প্রয়াস আছে। আশা করি বিদগ্ধ মনস্বী পাঠক সংখ্যাটি পাঠে উপকৃত হবেন, ঋদ্ধ হবেন।

নববর্ষের শুভলগ্নে *ভারত বিচিত্রা*র সকল পাঠককে জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

কর্মযোগ

বাংলাদেশকে ভারতের শুভেচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ গ্যাসঅয়েল সরবরাহ

ভারত বাংলাদেশে শুভেচ্ছার নিদর্শনস্বরূপ গ্যাসঅয়েল সরবরাহ করছে। ভারতের জ্বালানি ও প্রাকৃতিক গ্যাসসম্পদ মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান ১৭ মার্চ ২০১৬ পশ্চিমবঙ্গের শিলিগুড়ি থেকে বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে ২২০০ মেট্রিকটন গ্যাসঅয়েল বহনকারী একটি ট্রেনের উদ্বোধন করেন।

১৯ মার্চ ২০১৬ ট্রেনটি বাংলাদেশের পার্বতীপুর পৌঁছলে বাংলাদেশ সরকারের জ্বালানি ও প্রাকৃতিক গ্যাসসম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ এবং বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার হর্ষবর্ধন শ্রিংলা বাংলাদেশে চালানটি গ্রহণ করেন। বিষয়টি অতি গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি জ্বালানিখাতে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সহায়তার একটি উজ্জ্বল পদক্ষেপ যা ২০১৫ সালের জুনে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে গৃহীত যৌথ ঘোষণা 'নতুন প্রজন্ম, নয়া দিশা'-য় বর্ণিত ছিল।

স্মরণ করা যেতে পারে যে, একটি যৌথ উদ্যোগ কোম্পানির মাধ্যমে এনআরএল-এর শিলিগুড়ি মার্কেটিং টার্মিনাল (পশ্চিমবঙ্গ) থেকে বিপিসি-র দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর জ্বালানি পণ্য সংরক্ষণাগার পর্যন্ত ১৩০ কিমি ইন্দো-বাংলা ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন (আইবিএফএল) বাস্তবায়নের জন্য ২০ এপ্রিল ২০১৫ ঢাকায় এনআরএল ও বিপিসি-র মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকে এনআরএল এবং বিপিসি উভয়পক্ষ থেকে নিরপেক্ষ অংশগ্রহণের কথা বলা হয়। বিপিসি-র প্রস্তাবিত শুভেচ্ছা মূল্যে এনআরএল ২২০০ মেট্রিক টন গ্যাসঅয়েলের প্রথম চালানটি সরবরাহ করে। ●

উপরে ভাল সম্পর্ক গড়ে তুলতে খেলাধূলার মত কিছুই হয় না। ০৯ মার্চ ২০১৬ বাংলাদেশ বিমানবাহিনি ও ভারতীয় বিমানবাহিনির মধ্যে অনুষ্ঠিত প্রীতি ফুটবল ম্যাচের অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড় ও সমন্বয়কবৃন্দ
নীচে বামে খেলা আমাদের সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করে। ১১ মার্চ ২০১৬ মিরপুর জাতীয় ক্রিকেট স্টেডিয়ামে ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন ও বাংলাদেশ ক্রীড়া সাংবাদিক সমিতির মধ্যে এক প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়
নীচে ডানে ১৮ মার্চ ২০১৬ ঢাকাস্থ ভারতীয় হাই কমিশন ও গুলশান যুব সংঘের মধ্যে অনুরূপ আরেকটি প্রীতি ক্রিকেট ম্যাচে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়বৃন্দ

১৮ মার্চ ২০১৬ গুলশানের ইন্দিরা গান্ধী সাংস্কৃতিক মিলনায়তনে চিত্রশিল্পী প্রীতি আলীর 'পাওয়ার অফ পেইন এন্ড প্যাথোস' শীর্ষক একক চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিকবিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার হর্ষবর্ধন শ্রিংলা

বামে ১২ মার্চ ২০১৬ 'বাংলাদেশ ভারত কটন ফেস্ট ২০১৬' এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতীয় হাই কমিশনার হর্ষবর্ধন শ্রিংলা

ডানে ১৭ মার্চ ২০১৬ হাই কমিশনার শ্রী হর্ষবর্ধন শ্রিংলার সঙ্গে ভারতীয় নৌবাহিনির প্রধান হাইড্রোগ্রাফার রিয়ার অ্যাডমিরাল বিনয় বাধবার এনএম-এর সৌজন্য সাক্ষাৎ। ভারতীয় নৌবাহিনির প্রধান হাইড্রোগ্রাফার ১৬তম 'নর্থ ইন্ডিয়ান ওশান হাইড্রোগ্রাফিক কমিশন' সভায় অংশগ্রহণের জন্য বাংলাদেশে আসেন। ১৪-১৬ মার্চ ২০১৬ বাংলাদেশ নৌবাহিনির পৃষ্ঠপোষকতায় চট্টগ্রামে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়

১৬-১৮ মার্চ ২০১৬ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিভাগ আয়োজিত 'শান্তির জন্য সঙ্গীত' শীর্ষক সেমিনার ও ওয়ার্কশপের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী আসাদুজ্জামান নূর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মোহাম্মদ মিজানুদ্দিন, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে বাংলার একমাত্র পীঠস্থান বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রবীণ গায়ক আচার্য অমিয়রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাজশাহীতে নিযুক্ত ভারতের সহকারী হাই কমিশনার অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের কর্মব্যস্ততা

ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ সরবরাহের যৌথ উদ্বোধন

ভারত ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী যথাক্রমে শ্রী নরেন্দ্র মোদী ও শেখ হাসিনা ২৩ মার্চ ২০১৬ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভারতের ত্রিপুরা থেকে বাংলাদেশে (কুমিল্লা) ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহ এবং বাংলাদেশ (কক্সবাজার) থেকে ভারতে (আগরতলা) ১০ জিবিপিএস ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট রপ্তানি আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন।

এ উপলক্ষে ভারত ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও ভারতের বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজ ও বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আবুল হাসান মাহমুদ আলী এবং ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বক্তব্য রাখেন।

২০১১ সালে ত্রিপুরায় পালাটানা বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নকালে বাংলাদেশ সরকার ভারী যন্ত্রপাতি সরবরাহে অনুমতি প্রদান করায় ত্রিপুরা থেকে ১০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের লক্ষ্যে ২০১৪-র এপ্রিলে ঢাকায় অনুষ্ঠিত বিদ্যুৎবিষয়ক সপ্তম যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপ/স্টিয়ারিং কমিটির সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ত্রিপুরা থেকে এই বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হচ্ছে। গত ৯ জানুয়ারি ২০১৫ ঢাকায় ত্রিপুরার বিদ্যুৎ মন্ত্রীর সফরকালে অনুষ্ঠিত যৌথ কারিগরি কমিটির সভায় দামের বিষয়টি মীমাংসা করা হয়। পিজিসিআইএল সূর্যমণিনগর (আগরতলা) থেকে ভারতের সীমান্ত পর্যন্ত ৪০০ কেভি ক্ষমতাসম্পন্ন সঞ্চালন লাইন নির্মাণ করেছে। অন্যদিকে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে কুমিল্লা পর্যন্ত সঞ্চালন লাইন নির্মাণ করেছে পাওয়ার গ্রিড কর্পোরেশন অফ বাংলাদেশ লিমিটেড।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বাংলাদেশ সফরকালে ২০১৫ সালের জুন মাসে আখাউড়ায় আন্তর্জাতিক ব্যান্ডউইথ রপ্তানির লক্ষ্যে বাংলাদেশ সাবমেরিন কেবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল) এবং ভারত সঞ্চার নিগম লিমিটেড (বিএসএনএল)-এর মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। বিএসসিসিএল ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে আখাউড়া পর্যন্ত, আগরতলার কাছাকাছি, ৩০ কিমি দূরত্বসম্পন্ন অপটিক্যাল ফাইবার কেবল স্থাপন করেছে এবং বিএসএনএল সংশ্লিষ্ট যন্ত্রপাতিসমেত আগরতলায় আন্তর্জাতিক দূর-দৈর্ঘ্যের (আইএলডি) ফটক নির্মাণ করেছে।

ভারত ইতোমধ্যে বহরমপুর-ভেড়ামারা আন্তঃসংযোগ সঞ্চালন লাইনের মাধ্যমে বাংলাদেশে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ রপ্তানি শুরু করেছে। গত বছর ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর বাংলাদেশ সফরকালে একই আন্তঃসংযোগ লাইনের মাধ্যমে আরও ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহের ঘোষণা দেওয়া হয়। এছাড়া, ভারতের এনটিপিসি এবং বাংলাদেশের বিপিডিবি ১৩২০ মেগাওয়াটসম্পন্ন রামপাল বিদ্যুৎ প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি যৌথ উদ্যোগ (বিআইএফপিসিএল) হাতে নিয়েছে যেটি সম্পন্ন করার জন্য ভারতের ভেল (বিএইচইএল) কোম্পানি সম্প্রতি ইপিসি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও অন্যান্য খাতে উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সহযোগিতার জন্য অনেক ব্যক্তিগত ও সরকারি উদ্যোগ গ্রহণের প্রচেষ্টাও অব্যাহত রয়েছে।

বাংলাদেশ ও ত্রিপুরা ঐতিহ্যগতভাবে একটি বিশেষ সম্পর্ক লালন করে। এই প্রকল্পগুলো এই বিশেষ সম্পর্কে একটি অনন্য মাত্রা যোগ করে। এসব প্রকল্প দুই দেশের উইন-উইন অংশীদারিত্বের প্রতীক। বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের বিদ্যুৎ ঘাটতি মেটানোর লক্ষ্যে বিদ্যুৎখাতে বিদ্যমান দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার ক্ষেত্রে এই বিদ্যুৎ সংযোগ আরেকটি সাফল্যের মাত্রা যোগ করেছে। ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ রপ্তানি ত্রিপুরা তথা ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের জনগণের জন্য নির্ভরযোগ্য ও দ্রুত ইন্টারনেট সংযোগ পেতে সহায়তা করবে। •

ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ভারত ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীদের বিদ্যুৎ ও ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথ সরবরাহ উদ্বোধন

বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা মেটাতে সহযোগিতা করতে পেরে আমরা আনন্দিত: শ্রিংলা

বাংলাদেশকে ভারতের গ্যাসঅয়েল সরবরাহ ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে ক্রমবর্ধিষ্ণু বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে জ্বালানিখাতে একটি যুগান্তকারী ঘটনা। গত বছর ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বাংলাদেশ সফরকালে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সম্পাদিত 'নতুন প্রজন্ম, নয়া দিশা' শীর্ষক যৌথ ঘোষণার আলোকে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জ্বালানি চাহিদা মেটাতে দেশটিকে সহযোগিতা

করতে পেরে আমরা দারুণভাবে আনন্দিত। ১৯ মার্চ ২০১৬ বাংলাদেশের পার্বতীপুরে ভারত থেকে বাংলাদেশে গ্যাসঅয়েল বহনকারী শুভেচ্ছা ট্রেনবরণ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনার হর্ষবর্ধন শ্রিংলা এ কথা বলেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর জ্বালানিবিষয়ক উপদেষ্টা তৌফিক এলাহী চৌধুরী, বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ, বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মো. মাহমুদ রেজা খান প্রমুখ।

ভারতীয় হাই কমিশনার বলেন, 'বাংলাদেশ সরকার আয়োজিত ভারত থেকে বাংলাদেশে নুমালিগড় রিফাইনারি লিমিটেড কর্তৃক বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনে সরবরাহকৃত গ্যাসঅয়েল বহনকারী শুভেচ্ছা ট্রেন বরণ অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারা আমার জন্য অতীব আনন্দের বিষয়।'

শ্রী শ্রিংলা বলেন, 'আমি নিশ্চিত যে, অচিরেই আমরা বাংলাদেশে গ্যাসঅয়েল সরবরাহের লক্ষ্যে ২০ এপ্রিল ২০১৫ নুমালিগড় রিফাইনারি লিমিটেড ও বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারক অনুসারে ভারত-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ পাইপলাইন (আইবিএফপিএল) উদ্বোধন করতে পারব। এটি জ্বালানিখাতে ভারত-বাংলাদেশ সহযোগিতার সেরা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।'

তিনি আরও বলেন, 'ভারত তার ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী বাংলাদেশের সঙ্গে বিদ্যুৎ, জ্বালানি, বাণিজ্য, রেলওয়ে, টেলিকম এবং সাইবার যোগাযোগসহ সম্পর্কের অন্যান্য ক্ষেত্রে ব্যাপক সহযোগিতা বৃদ্ধিতে আগ্রহী কেন-না আমরা চাই আমাদের অর্থনীতিকে পুনরায় একীভূত করতে যাতে করে এগুলি উপ-আঞ্চলিক এবং আঞ্চলিক অর্থনৈতিক প্রবাহে আরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।'

তিনি এ প্রকল্প বাস্তবায়নে সহযোগিতাদানে বাংলাদেশ সরকার এবং বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনকে ধন্যবাদ জানান। তিনি একইসঙ্গে দুই দেশের নেতাদের নির্দেশনা পূরণে উদ্যোগ গ্রহণ করায় নুমালিগড় রিফাইনারি লিমিটেড ও বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন উভয় সংস্থার কর্মকর্তাদের অভিনন্দন জানান এবং প্রকল্পটি বাস্তবায়নে তাদের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করেন। ●

উপরে ভারত থেকে বাংলাদেশের পার্বতীপুরে গ্যাসঅয়েল বহনকারী শুভেচ্ছা ট্রেনটি বরণ করে নিচ্ছেন বাংলাদেশ ও ভারতের প্রতিনিধিবৃন্দ
নীচে ২৯-৩০ মার্চ ২০১৬ ঢাকায় অনুষ্ঠিত মোটর ভেহিকল চুক্তির বিষয়ে 'বিবিআইএন' নোডাল অফিসারদের সম্মেলন

উপরে বামে মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তরাধিকারীদের জন্য 'মুক্তিযোদ্ধা স্কলারশিপ স্কিম'-এ ভারত সরকারের বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের একাংশ
উপরে ডানে মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা স্কলারশিপ বিতরণ করছেন বাংলাদেশ সরকারের মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক। অনুষ্ঠানে ভারতীয় হাই কমিশনার হর্ষবর্ধন শ্রিংলা উপস্থিত ছিলেন
নীচে ২৫ মার্চ ২০১৬ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে আয়োজিত মুক্তিযুদ্ধ একাডেমির 'স্বাধীনতা উৎসব ২০১৬'-য় বক্তারা ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর ভুটান ও ভারতের বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের বিষয়টি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন

মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তরাধিকারীদের জন্য ভারতের শিক্ষাবৃত্তি

২০ মার্চ ২০১৬ বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক ঢাকা অঞ্চলের মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তরাধিকারীদের মধ্যে চেক হস্তান্তর করেন। ভারতীয় হাই কমিশন ও বাংলাদেশ-ভারত

মৈত্রী সমিতি যৌথভাবে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

ভারত সরকার ২০০৬ সালে মুক্তিযোদ্ধাদের উত্তরাধিকারীদের জন্য 'মুক্তিযোদ্ধা স্কলারশিপ স্কিম'-এর সূচনা করে। উচ্চ মাধ্যমিক ও স্নাতক-পূর্ব শিক্ষার্থীদের এ বৃত্তি দেওয়া হয়। স্নাতক-পূর্ব শিক্ষার্থীরা বছরে ২৪,০০০/= টাকা করে ৪ বছর এবং উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষার্থীরা বছরে ১০,০০০/= করে ২ বছর এ বৃত্তি পেয়ে থাকে। এ পর্যন্ত ৯ হাজার ৫০০ শিক্ষার্থী এ স্কিমে উপকৃত হয়েছে এবং ১৩ কোটি টাকা বণ্টন করা হয়েছে। প্রত্যেক বিভাগ থেকে মেধার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের মনোনীত করা হয়। জাতীয় জাদুঘরের অনুরূপ অনুষ্ঠান পরবর্তী কয়েক সপ্তাহ ধরে সকল বিভাগে আয়োজন করা হবে।

জাতীয় জাদুঘরে আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিকবিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী এবং বিপুলসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা উপস্থিত ছিলেন। •

উপরে ২৬ মার্চ ২০১৬ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগের শিক্ষার্থীদের বার্ষিক চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধনে অংশগ্রহণ করেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ড. মোহাম্মদ মিজানুদ্দিন, বরেণ্য কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক এবং রাজশাহীতে নিযুক্ত ভারতের সহকারী হাই কমিশনার অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায়

নীচে ২৮ মার্চ ২০১৬ জাতীয় স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতার রাজশাহী অঞ্চলের ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি অভিজিৎ চট্টোপাধ্যায় খেলোয়াড়দের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করছেন

রঙের উৎসব হোলি

ফাল্গুনী পূর্ণিমা বা দোলপূর্ণিমার দিন বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ আবির ও গুলাল নিয়ে রাধিকা ও গোপীদের সঙ্গে রঙের খেলায় মেতে উঠতেন। সেই ঘটনা থেকেই দোল খেলার উৎপত্তি। দোলযাত্রা উৎসবের একটি ধর্মনিরপেক্ষ দিকও রয়েছে। এই দিন সকাল থেকেই নারীপুরুষ নির্বিশেষে আবির, গুলাল ও বিভিন্ন প্রকার রঙ নিয়ে খেলায় মেতে ওঠে। শান্তিনিকেতনে বিশেষ নৃত্যগীতের মাধ্যমে বসন্তোৎসব পালনের রীতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সময়কাল থেকেই চলে আসছে। দোলপূর্ণিমার দিনই বসন্তোৎসবের আয়োজন করা হয়। আগের রাতে হয় বৈতালিক। দোলের দিন সকালে 'ওরে গৃহবাসী খোল দ্বার খোল' গানটির মাধ্যমে মূল অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। উত্তর ভারতে হোলি উৎসবটি বাংলার দোলযাত্রার পরদিন পালিত হয়।

এই উৎসবে বয়সের ভেদাভেদ নেই, উঁচু-নীচু প্রভেদ নেই, জাতি-ধর্ম-বর্ণের নিষেধ নেই। উৎসবে মেতেছেন বাংলাদেশে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিক, হর্ষবর্ধন শ্রিংলাসহ হাই কমিশনের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং তাদের পরিবারবর্গ।

• নিজস্ব প্রতিনিধি

বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতি

হোমটাউন প্রজেক্ট, লেভেল # ১৬, সুট # ১৫বি
৮৭ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা-১০০০
E-mail: info@bifs.org.bd, b_ifs@yahoo.com
(জিপিও বক্স # ৭৭৫)
ওয়েবসাইট: www.bifs.org.bd

ABSSI
Association of Bangladeshi Students Studied in India

ভারতে উচ্চশিক্ষা লাভকারী শিক্ষার্থী সমিতি
President: Dr. Dalem Chandra Barman
VC, ASA University, Dhaka
Phone: 01552 334300
Secretary: Shamim Al-Mamun
Phone: 01715 902146

শ্রদ্ধাঞ্জলি

ভীমরাও রামজী আম্বেদকর

ডক্টর ভীমরাও রামজী আম্বেদকর (১৪ এপ্রিল ১৮৯১ - ৬ ডিসেম্বর ১৯৫৬) ছিলেন ভারতের একজন উচ্চমানের ব্যবহারশাস্ত্রবিদ, রাজনৈতিক নেতা, বৌদ্ধ আন্দোলনকারী, দার্শনিক, চিন্তাবিদ, নৃতত্ত্ববিদ, ঐতিহাসিক, বাগ্মী, বিশিষ্ট লেখক, অর্থনীতিবিদ, পণ্ডিত, সম্পাদক, রাষ্ট্রবিপ্লবী ও বৌদ্ধ পুনর্জাগরণবাদী। তিনি বাবাসাহেব নামেও পরিচিত ছিলেন। তিনি ভারতের সংবিধানের খসড়া কার্যনির্বাহক কমিটির সভাপতিও ছিলেন। তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদী এবং ভারতের দলিত আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা– ভারতের সংবিধানের প্রধান নির্মাতা।

ভীমরাও রামজী আম্বেদকর ভারতের গরীব 'মহর' পরিবারে (তখন অস্পৃশ্য জাতি হিসেবে গণ্য হত) জন্মগ্রহণ করেন। আম্বেদকর সারাটা জীবন সামাজিক বৈষম্যমূলক 'চতুর্বর্ণ পদ্ধতি'– হিন্দু সমাজের চারটি বর্ণ এবং ভারতবর্ষের অস্পৃশ্য প্রথার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে গেছেন। একপর্যায়ে তিনি বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হন এবং হাজারো অস্পৃশ্যদের থেরবাদী বৌদ্ধ ধর্মের পতাকাতলে সমবেত করে সম্মানিত হন। আম্বেদকরকে ১৯৯০ সালে মরণোত্তর 'ভারতরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। বহু সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাধাবিপত্তি পেরিয়ে 'সমাজবহির্ভূত ব্যক্তি' হিসেবে ভারতে কলেজজীবন শেষে আম্বেদকর যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং লন্ডনের লন্ডন স্কুল অফ ইকনোমিক্স এবং গ্রে'স ইন্ থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করার পর বিদ্বান ব্যক্তি হিসেবে সুনাম অর্জন করেন এবং দেশে ফিরে আইন ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন। পরে তিনি ভারতের অস্পৃশ্যদের সামাজিক অধিকার ও সামাজিক স্বাধীনতার জন্য কলম ধরেন এবং সংবাদপত্র প্রকাশ করেন।

বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষালাভের পর ভারতের বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের একাংশ তাঁকে 'বোধিসত্ত্ব' (গৌতম বুদ্ধের পূর্বজন্ম) উপাধিতে সম্মানিত করেন, যদিও তিনি নিজেকে 'বোধিসত্ত্ব' হিসেবে কখনো দাবি করেননি।

আম্বেদকর ১৮৯১ সালের ১৪ এপ্রিল ভারতের কেন্দ্রীয় প্রদেশের (বর্তমান মধ্য প্রদেশ) ক্যান্টনমেন্ট শহর মোহ (Mhow) -এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন রামজী মালোজী সাকপাল এবং ভীমাবাঈয়ের চতুর্দশ তথা সর্বকনিষ্ঠ পুত্র। তাঁদের পরিবার মারাঠী অধ্যুষিত অধুনা মহারাষ্ট্রের রত্নগিরি জেলার আম্বাভাদে শহর থেকে এখানে এসেছিলেন। তাঁরা ছিলেন হিন্দু সম্প্রদায়ের অস্পৃশ্য মহর জাতিভুক্ত। আম্বেদকরের পূর্বপুরুষেরা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাবাহিনিতে কাজ করতেন। তাঁর বাবা রামজী সাকপালও মোহ সেনানিবাসে সুবেদার পদে কাজ করতেন। তিনি গৎবাঁধা পদ্ধতিতে মারাঠি এবং ইংরেজিতে শিক্ষালাভ করেন।

তিনি প্রাথমিক শিক্ষালাভে কঠোর পরিশ্রম করার জন্য সন্তানদের উদ্বুদ্ধ করতেন। রামজী সাকপাল তাঁর সন্তানদের সংস্কৃত ভাষা শিখতেও উদ্বুদ্ধ করতেন বলে জানা যায়। আম্বেদকর অন্যান্য অস্পৃশ্য বালকদের সঙ্গে বিদ্যালয়ে গেলে তাদের আলাদা করে দেওয়া হত। শিক্ষকরা তাদের প্রতি মনোযোগ দিতেন না– শ্রেণিকক্ষের ভেতরেও বসার অনুমতি ছিল না। তৃষ্ণা পেলে উচ্চশ্রেণির কেউ একজন স্পর্শ বাঁচিয়ে ওপর থেকে পানি ঢেলে দিত– তাদের জগ ধরার অনুমতি ছিল না। এই কাজটি সাধারণত করত বিদ্যালয়ের পিওন। সে না থাকলে সারাদিন পানি ছাড়াই কাটাতে হত। আম্বেদকর এই অবস্থাকে বলেছিলেন– 'নো পিওন, নো ওয়াটার'।

১৮৯৪ সালে রামজী সাকপাল সেনাবাহিনি থেকে অবসর নেন এবং দুই বছর পরে সপরিবারে 'সতর'-এ চলে আসেন। এর কিছুদিনের মধ্যে শিশু আম্বেদকরের মা মারা যান। তাঁরা মাসীর আশ্রয়ে কষ্টের মধ্যে লালিত হতে থাকেন। ভাইবোনদের মধ্যে বলরাম, আনন্দরাও ও ভীমরাও এবং মঞ্জুলা ও তুলাসা অন্যদের দেখভাল করতেন। এঁদের মধ্যে আম্বেদকরই শুধু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে স্নাতক ডিগ্রি লাভে সক্ষম হন। ভীমরাও সাকপাল আম্বেদকরের কূলনামটি এসেছে 'রত্নগিরি' জেলার নিজগ্রাম আম্বভাদ (Ambavade) থেকে। তাঁর প্রিয় ব্রাহ্মণ শিক্ষক মহাদেব আম্বেদকর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তাঁর নাম পরিবর্তন করে নিজের গ্রামের নামানুসারে 'আম্বেদকর' রাখেন।

উচ্চতর শিক্ষা

আম্বেদকর ১৯০৩ সালে মাত্র ১২ বছর বয়সে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং পরিবারসহ মুম্বইয়ে চলে আসেন। এলফিন্স্টোন হাই স্কুলে আম্বেদকরই ছিলেন প্রথম অস্পৃশ্য ছাত্র। শিক্ষাদীক্ষায় সবাইকে ছাড়িয়ে গেলেও ক্রমাগত বৈষম্যের শিকার হয়ে তিনি প্রচলিত ব্যবস্থার প্রতি বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন। ১৯০৭ সালে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রথম অস্পৃশ্য হিসেবে ভারতের বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। এই সাফল্যে তাঁর সম্প্রদায় একটি সামাজিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে এবং তাঁদের পারিবারিক বন্ধু ও শিক্ষক কৃষ্ণজী অর্জুন কেলুস্কর (দাদা কেলুস্কর) তাঁকে তাঁর লেখা গৌতম বুদ্ধের একটি জীবনী উপহার দেন। ৯ বছরের রামাবাঈয়ের সঙ্গে হিন্দু রীতি মেনেই আম্বেদকরের বিয়ে হয়। ১৯০৮ সালে তিনি এলফিন্স্টোন কলেজে ভর্তি হন এবং বারোদার মহারাজা তৃতীয় সায়াজীরাও গায়কোয়াড-এর মাসিক ২৫ রুপির বৃত্তি লাভ করেন। ১৯১২ সালে তিনি বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্থনীতি এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ডিগ্রি লাভ করে বারোদা রাজ্য সরকারের চাকরিলাভে তৎপর হন। সেই বছরেই তাঁর প্রথম সন্তান যশোবন্ত জন্মগ্রহণ করে। এসময় তাঁর স্ত্রী তাঁদের নতুন ছোট পরিবারটি চালাতেন। এর কিছুদিন পরে অসুস্থ পিতাকে দেখতে তিনি মুম্বই চলে আসেন। তাঁর বাবা ১৯১৩ সালের ২ ফেব্রুয়ারি মৃত্যুবরণ করেন।

১৯১৩ সালে তিনি মহারাজা তৃতীয় সায়াজীরাও গায়কোয়াড-এর মাসিক সাড়ে এগার পাউন্ডের তিন বছর মেয়াদী বৃত্তি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে যান এবং নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি বিভাগে স্নাতকোত্তর ছাত্র হিসেবে ভর্তি হন। নিউইয়র্কে তিনি তাঁর পারসি বন্ধু নাভাল ভাতেনার সঙ্গে লিভিংস্টোন হলে থাকতেন। 'লো' লাইব্রেরিতে তিনি দৈনিক চার ঘণ্টা পড়াশুনা করতেন। ১৯১৫ সালের জুন মাসে তিনি প্রধানত অর্থনীতি, এছাড়াও অন্য বিষয়গুলো যেমন সমাজবিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শনশাস্ত্র এবং নৃতত্ত্ব বিষয়ে উত্তীর্ণ হয়ে এম এ পাশ করেন। তাঁর থিসিসের বিষয় ছিল 'প্রাচীন ভারতের বাণিজ্য'। ১৯১৬ সালে তিনি পুনরায় এম এ করেন, থিসিসের নাম 'ভারতের জাতীয় লভ্যাংশ– একটি ঐতিহাসিক ও বিশ্লেষণী গবেষণা সমীক্ষা'। তৃতীয় থিসিসের পর ১৯১৭ সালে তিনি অর্থনীতিতে পিএইচ ডি ডিগ্রি লাভ করেন। এবছরের ৯ মে নৃতত্ত্ববিদ প্রফেসর আলেকজান্ডার গোল্ডেনউইজার আয়োজিত সেমিনারে তিনি 'ভারতে বর্ণসমূহ: তাদের উৎপত্তি, গঠন ও বিকাশ' শীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করেন।

১৯১৬ সালের অক্টোবরে তিনি লন্ডনের 'গ্রে'স ইন্'-এ বার-অ্যাট ল'য়ে ভর্তি হন। একই সময়ে লন্ডন স্কুল অফ ইকোনোমিক্স-এ ভর্তি হয়ে ডক্টরাল থিসিসের কাজ শুরু করেন। ১৯১৭ সালে জুন মাসে বারোদা বৃত্তির মেয়াদ শেষে তিনি ভারতে ফিরে আসেন। তাঁর মূল্যবান ও প্রিয় বইয়ের বিশাল সম্ভার অপর জাহাজযোগে আসছিল। পথে একটি জার্মান সাবমেরিনের টর্পেডো চার্জে জাহাজটি নিমজ্জিত হয়। এ ঘটনা কর্তৃপক্ষকে অবহিত করলে তিনি লন্ডনে ফিরে চার বছরের মধ্যে থিসিস জমা দেওয়ার অনুমতি পান। প্রথম সুযোগেই তিনি লন্ডনে ফিরে যান এবং ১৯২১ সালে তিনি এম এ ডিগ্রি নেন। এবারের থিসিসের বিষয় ছিল: 'ভারতীয় রুপির সমস্যা: এর উৎপত্তি ও সমাধান'। ১৯২৩ সালে তিনি ডক্টর অফ ইকোনোমিক্স ডিগ্রি লাভ করেন। একই সময়ে তিনি ব্যারিস্টারিও পাশ করেন। এরপর ১৯৫২ সালে কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৯৫৩ সালে ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি সম্মানসূচক পিএইচ ডি ডিগ্রি লাভ করেন।

ভারতের নেতৃস্থানীয় জ্ঞানী ব্যক্তি হিসেবে আম্বেদকরকে ১৯১৯ সালে সাউথবোরো কমিটিতে সাক্ষ্যদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়। এখানে আম্বেদকর পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী এবং অন্ত্যজদের জন্য বাসস্থানের দাবি তোলেন। ১৯২০ সালে তিনি মুম্বইয়ে 'মুকনায়ক' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় তিনি গোঁড়া হিন্দু রাজনীতিকদের কঠোর সমালোচনা এবং জাত-পাতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের এক বৈঠকে কোলাহপুরের রাজা তাঁর বক্তব্যে মোহিত হয়ে তাঁকে 'ভবিষ্যতের জাতীয় নেতা' হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং গোঁড়াবাদীদের অবাক করে তাঁর সঙ্গে নৈশভোজে অংশগ্রহণ করেন।

আইন ব্যবসায়ের সূচনায় আম্বেদকর কিছু ব্রাহ্মণের তিন অ-ব্রাহ্মণ নেতা কে বি বাগদে, কেশাভরাও জেদহে এবং দিনকোরাও জাভালকরের বিরুদ্ধে আনীত মকদ্দমায় জড়িয়ে পড়েন। আম্বেদকরের বাকপটুতা ও দক্ষতার সঙ্গে যুক্তিপূর্ণ তথ্য উপস্থাপনে আইনি লড়াইয়ে তাঁরা জয়ী হন। এ ঘটনায় আম্বেদকরের সুনাম ছড়িয়ে পড়ে।

লক্ষ্যসমূহ

বোম্বে হাইকোর্টে আইন ব্যবসায়কালে আম্বেদকর অস্পৃশ্যদের শিক্ষিত করে তুলতে মরিয়া হয়ে ওঠেন। গৃহহীন অন্ত্যজ জাতির শিক্ষা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে তিনি গড়ে তোলেন 'জাতিচ্যুত হিতকারিণী সভা'। ১৯২৭ সালে তিনি অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি গণআন্দোলন শুরু করেন এবং সুপেয় পানির উৎস দানে সংগ্রাম চালিয়ে যান। উল্লেখ্য সে-সময় হিন্দু মন্দিরে নিম্নবর্ণের মানুষের প্রবেশাধিকার ছিল না। ১৯২৫ সালে তাঁকে ইউরোপীয় সীমন কমিশনের সঙ্গে কাজ করার জন্য বোম্বে প্রেসিডেন্সি কমিটিতে রাখা হয়।

পুনে চুক্তি

খ্যাতি ও অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ের ব্যাপক সমর্থনের কারণে আম্বেদকরকে ১৯৩২ সালে লন্ডনে দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। মহাত্মা গান্ধী হিন্দু সমাজে ভবিষ্যতে বিভক্তির আশংকায় অস্পৃশ্যদের জন্য গঠিত পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর প্রচণ্ড বিরোধিতা করেন, যদিও তিনি অন্য সব সংখ্যালঘু যেমন মুসলমান ও শিখদের পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী বিনা দ্বিধায় মেনে নেন। ১৯৩২ সালে ব্রিটিশরা আম্বেদকরের সঙ্গে একমত হয়ে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী ঘোষণা করলে মহাত্মা গান্ধী শুধুমাত্র অন্ত্যজ সম্প্রদায়ের পৃথক নির্বাচকমণ্ডলীর বিরোধিতা করে পুনের এরোদা কেন্দ্রীয় কারাগারে উপবাস শুরু করেন। গান্ধীর উপবাসে ভারতজুড়ে ব্যাপক বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় এবং ধর্মীয় গোঁড়াবাদী নেতৃবৃন্দ যেমন কংগ্রেসের মদনমোহন মালব্য ও পালঙ্কর বালো ও তাঁর সমর্থকরা আম্বেদকরের সঙ্গে এরাভাদে যৌথ বৈঠক করেন। গান্ধীবাদীদের প্রবল চাপের মুখে এবং সাম্প্রদায়িক প্রতিশোধ ও অস্পৃশ্য সম্প্রদায় নিধনের আশংকায় আম্বেদকর পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী বাতিলে সম্মত হন। এই চুক্তির পরে গান্ধী উপবাস ভঙ্গ করেন। ইতিহাসে এটি পুনে চুক্তি নামে পরিচিত।

রাজনৈতিক অবদান

আম্বেদকর ১৯৩৫ সালে মুম্বইয়ের সরকারি আইন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ পান, সেখানে দু'বছর ছিলেন। মুম্বইয়ে বসবাসের জন্য তিনি একটি বাড়ি তৈরি করেন এবং সেখানে ৫০ হাজারেরও বেশি বইসমৃদ্ধ একটি ব্যক্তিগত পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেন। এ বছরেই তাঁর প্রথ

ড. বি আর আম্বেদকর ॥ স্বাধীন ভারতের কনস্টিটিউট এসেম্বলির প্রথম অধিবেশনে বিখ্যাত নেতৃবৃন্দের একাংশ

মা স্ত্রী রামাবাই দীর্ঘ রোগভোগের পর মৃত্যুবরণ করেন। অসুস্থ অবস্থায় রামাবাঈ পান্দরপুর তীর্থে যাওয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলে আম্বেদকর বলেন, হিন্দু পান্দরপুরের পরিবর্তে তিনি তাঁকে বরং একটি নতুন পান্দরপুর বানিয়ে দেবেন। ১৩ অক্টোবর নাসিকের কাছে ঈওলার বৈঠকে আম্বেদকর ধর্ম ত্যাগের অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন এবং তাঁর অনুগতদের হিন্দু ধর্ম ত্যাগে প্রণোদিত করেন। ভারতের বিভিন্ন জনসভায় তিনি তাঁর আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেন। ১৯৩৬ সালে আম্বেদকর স্বাধীন শ্রমিক দল (ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টি) প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৩৭ সালের কেন্দ্রীয় আইন প্রণয়ন পরিষদ বা বিধানসভা নির্বাচনে তাঁর দল ১৫টি আসন লাভ করেন। নিউইয়র্কে লিখিত গবেষণালব্ধ তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে একই বছর তাঁর *এনিহিলেশন অফ কাস্ট* বইটি প্রকাশিত হয়। এখানে আম্বেদকর বর্ণ প্রথা ও গোঁড়াবাদী ধর্মীয় নেতাদের তীব্র সমালোচনা করেন। আম্বেদকর শ্রম মন্ত্রী হিসেবে প্রতিরক্ষা উপদেষ্টা কমিটি এবং ভাইসরয়ের নির্বাহী পরিষদে যোগ দেন। তিনি অস্পৃশ্যদের প্রতি কংগ্রেস ও গান্ধীর আচরণের তীব্র বিরোধিতা করেন। *কারা শূদ্র ছিল?* বইয়ে তিনি হিন্দু বর্ণপ্রথায় পুরোহিততন্ত্রের হাতে শূদ্র ও অতিশূদ্র সৃষ্টির বিষয়ে আলোকপাত করেন। তিনি দেখান শূদ্ররা কীভাবে অস্পৃশ্যদের থেকে আলাদা। তিনি নিখিল ভারত সিডিউলড্ কাস্টস্ ফেডারেশন গঠন করেন, যদিও ফেডারেশন ১৯৪৬-এ ভারতের সংবিধান পরিষদের নির্বাচনে ভাল ফল করেনি। পরে তিনি বঙ্গীয় সংবিধান পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন যেখানে মুসলিম লিগ ক্ষমতাসীন হয়।

পাকিস্তান বা ভারতের সীমানা

১৯৪১ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে আম্বেদকর বহুসংখ্যক বই ও ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করেন। *থটস্ অন পাকিস্তান*-এ তিনি মুসলিম লিগের দাবিকৃত স্বতন্ত্র পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন। এ ব্যাপারে তিনি লেখেন, যদি মুসলমানরা সত্যিই পাকিস্তান চায়, তাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। তিনি বলেন, তারা যদি পাকিস্তানের বশ্যতা স্বীকার করে তবে তাদের অবশ্যই সে অধিকার দেওয়া হবে। ভারতের প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে সেনা বাহিনিতে নিয়োজিত মুসলমানদের বিশ্বাস করা যায় কিনা তা নিয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন। মুসলমানরা যদি ভারত আক্রমণ করে অথবা মুসলমান বিদ্রোহ হয়, তবে ভারতীয় মুসলিম সেনারা কার পক্ষ নেবে? ভারতের সুরক্ষার জন্য মুসলমানরা যেভাবে চায় সেভাবে পাকিস্তানকে মেনে নেওয়া উচিত বলে তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন। আম্বেদকর বলেন, হিন্দু ও মুসলমান দুটি ভিন্ন জাতি হলেও একত্রে একটি রাষ্ট্রে সহাবস্থান করতে পারে বলে হিন্দুদের যে ধারণা, তা একটি বিকৃত পরিকল্পনা ছাড়া কিছু নয়।

ভারতের সংবিধান খসড়ায় অবদান

১৯৪৭ সালে ১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতার প্রথম প্রহরে নবগঠিত কংগ্রেস সরকার আম্বেদকরকে দেশের প্রথম আইনমন্ত্রী পদে বরণ করে নেয়, যা তিনি সানন্দে গ্রহণ করেন। ২৯ আগস্ট আম্বেদকরকে সংবিধান খসড়া কমিটির সভাপতি করা হয়। এ কাজে তিনি তাঁর সহপাঠী ও সমকালীন পর্যবেক্ষকদের কাছ থেকে প্রচুর প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন। প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মের সংঘ চর্চাবিষয়ে তাঁর ব্যাপক পড়াশোনা একাজে সহায়ক হয়েছিল। ব্যালটের মাধ্যমে ভোট প্রদান, তর্ক-বিতর্ক ও অগ্রবর্তী নীতিমালা, করণীয় বিষয়সূচি, সভা-সমিতি ও ব্যবসায় সংক্রান্ত প্রস্তাবনাসমূহের ব্যবহার ইত্যাদি সংঘ চর্চার অনুষঙ্গ ছিল। প্রাচীন ভারতের কিছু রাষ্ট্রীয় প্রজাতান্ত্রিক উপজাতিগোষ্ঠী যেমন শাক্যবংশ ও লিচ্ছবিরা সংঘ চর্চার সূচনা করেন। অতঃপর আম্বেদকর তাঁর সাংবিধানিক অবয়ব তৈরিতে পশ্চিমা প্রণালীর ব্যবহার করেন।

গ্রানভিলে অস্টিন আম্বেদকর প্রণীত ভারতীয় সংবিধান খসড়াকে ‘একনিষ্ঠ ও সর্বোত্তম সামাজিক নথি’ হিসেবে বর্ণনা করেন। ভারতের অধিকাংশ সাংবিধানিক শর্ত সরাসরি সামাজিক বিপ্লবের সমর্থনে উপনীত হয়েছে অথবা প্রয়োজনীয় শর্ত আরোপের মাধ্যমে রাষ্ট্রবিপ্লবকে পরিপুষ্ট করার চেষ্টা করেছে। আম্বেদকর ভারতের সাধারণ মানুষের প্রতি সর্বাধিক সাংবিধানিক নিশ্চয়তা ও সুরক্ষা প্রদান করেছেন যেমন ধর্মীয় স্বাধীনতা, অস্পৃশ্যতা বিলোপ এবং সব ধরনের বৈষম্যের অবসান। আম্বেদকর নারীদের অধিকতর অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করেন। তিনি সংবিধানে তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতীয় ও অন্যান্য পশ্চাদ্‌পদ শ্রেণির জন্য স্কুল, কলেজ ও সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেন, যা নিঃসন্দেহে ইতিবাচক পদক্ষেপ। ভারতের আইন প্রণেতারা আশা করেন এর মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক বিভাজন দূর হবে ও ভারতীয় অস্পৃশ্যরা সুযোগ-সুবিধা পাবে। ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর গণ-পরিষদে সংবিধানটি গৃহীত হয়। তিনি অভিন্ন দেওয়ানী বিধি প্রণয়নের ইচ্ছা পোষণ করেন। তিনি উত্তরাধিকার ও বিবাহ ক্ষেত্রে আইনি লিঙ্গসাম্য নিশ্চিত করতে হিন্দু কোড বিলের খসড়া প্রণয়ন করেন কিন্তু খসড়াটি সংসদে উত্থাপিত না হওয়ায় আম্বেদকর ১৯৫১ সালে মন্ত্রী পরিষদ থেকে পদত্যাগ করেন। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু, মন্ত্রীসভা ও অনেক কংগ্রেস নেতা বিলটির প্রতি সমর্থন জানালেও বেশিরভাগ সাংসদ এর সমালোচনা করেন। আম্বেদকর ১৯৫২-র লোকসভা নির্বাচনে বোম্বের একটি আসন থেকে নির্বাচন করে হেরে যান। পরে তাঁকে ১৯৫২ সালের মার্চ মাসে পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় নিয়োগদান করা এবং মৃত্যুর আগে পর্যন্ত এ পদে বহাল ছিলেন।

প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর ভারতীয় সংবিধানে স্বাক্ষরদান ॥ ১৯৫০ সালের ১০ আগস্ট রাষ্ট্রপতি ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদের ভারতীয় সংবিধানে স্বাক্ষরদান

বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ

আম্বেদকর সারাজীবন বৌদ্ধ ধর্ম অধ্যয়ন করেন, তবে ১৯৫০-এর দিকে তিনি এই ধর্মে সম্পূর্ণ মনোযোগ দেন এবং বৌদ্ধ পণ্ডিত ও ভিক্ষুদের একটি সম্মেলনে যোগ দিতে শ্রীলঙ্কা ও পরে শিলং ভ্রমণ করেন। পুনের কাছে একটি নতুন বৌদ্ধ মন্দিরে অঞ্জলি নিবেদনের সময় তিনি ঘোষণা দেন যে, তিনি বৌদ্ধ ধর্মের উপর একটি বই লিখছেন এবং শীঘ্রই বইটি শেষ হবে। তারপর তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করবেন। ১৯৫৫ সালে তিনি ভারতীয় বৌদ্ধ মহাসভা গঠন করেন। ১৯৫৬ সালে তিনি তাঁর সর্বশেষ বই *বুদ্ধ ও তাঁর ধম্ম*-র কাজ শেষ করেন। বইটি তাঁর মৃত্যুর পর ছাপানো হয়। যাহোক, শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধভিক্ষু হাম্মালবা সাদ্ধ্যতিষ্যর সঙ্গে বৈঠকের পর ১৯৫৬ সালের ১৪ অক্টোবর আম্বেদকর নাগপুরে তাঁর অনুসারীদের নিয়ে এক গণ-অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন এবং একজন বৌদ্ধভিক্ষুর কাছ থেকে ত্রিশরণ ও পঞ্চশীল গ্রহণের মাধ্যমে তিনি সস্ত্রীক তাঁর ধর্মান্তরকরণ সম্পন্ন করেন। তারপর তিনি তাঁর প্রায় ৫ লাখের মত সহযোগীর সবাইকে ধর্মান্তরিত করান। এখানে বলা দরকার, ১৯৩৫ সালে দীর্ঘ রোগভোগের পর তাঁর স্ত্রী রামাবাঈয়ের মৃত্যুর পর চল্লিশের দশকের শেষভাগে সংবিধানের খসড়া সম্পূর্ণ করার পর তিনি অনিদ্রাজনিত নানা রোগে আক্রান্ত হন। চিকিৎসার এক পর্যায়ে তিনি বোম্বে গিয়ে সারদা কবির নামে এক ব্রাহ্মণ ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা নেন। ১৯৪৮ সালের ১৫ এপ্রিল তিনি সারদাকে বিয়ে করেন। বিয়ের পর সারদার নতুন নাম হয় সবিতা আম্বেদকর। তিনি *বুদ্ধ ও কার্ল মার্ক্স* এবং *প্রাচীন ভারতে বিপ্লব ও প্রতিবিপ্লব* নামে দু'টি বই লেখেন, যা শেষ করে যেতে পারেননি।

মৃত্যু

১৯৪৮ সাল থেকে আম্বেদকর ডায়াবেটিস রোগে ভুগছিলেন। শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে ১৯৫৪ সালের জুন মাসে তিনি শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন ও দৃষ্টিশক্তি হারান। রাজনৈতিক কারণে তিনি ক্রমবর্ধমানভাবে অনেক ত্যক্তবিরক্ত হয়ে উঠছিলেন, যা তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে কাল হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৫৫ সালের পুরোটা জুড়ে প্রচণ্ডভাবে কাজ করার ফলে তাঁর শারীরিক অবস্থার অধিকতর অবনতি হয়। *বুদ্ধ ও তাঁর ধম্ম* বইটির সর্বশেষ পাণ্ডুলিপি তৈরির তিন দিন পর ১৯৫৬ সালের ৬ ডিসেম্বর তিনি দিল্লিতে তাঁর নিজ বাড়িতে ঘুমন্ত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

৭ ডিসেম্বর দাদর চৌপট্টি সমুদ্রসৈকতে বৌদ্ধ ধর্মীয় প্রথায় তাঁর শবদাহ হয়। প্রায় ৫ লাখ লোক তাঁর শেষকৃত্যে যোগ দেন। শেষকৃত্যে যোগদানকারীদের জন্য ১৬ ডিসেম্বর এক ধর্মান্তরকরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

আম্বেদকরের দ্বিতীয় স্ত্রী সবিতা আম্বেদকর ২০০৩ সালে মারা যান। ভাইয়াসাহেব আম্বেদকর নামে পরিচিত তাঁর পুত্র যশোবন্ত ও পুত্রবধূ মীরাবাঈ আম্বেদকর। আম্বেদকরের নাতি আম্বেদকর প্রকাশ যশোবন্ত ইন্ডিয়ান বুডিস্ট এসোসিয়েশনের প্রধান উপদেষ্টা। তিনি ভারিপা বহুজন মহাসংঘের নেতা এবং পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে দায়িত্ব পালন করেন।

আম্বেদকরের মৃত্যুর পর তাঁর দিল্লির ২৬ আলীপুর রোডের বাড়িতে একটি স্মারক স্থাপিত হয়। তাঁর জন্মদিন আম্বেদকর জয়ন্তী বা ভীম জয়ন্তী সরকারি ছুটির দিন। তাঁর জন্ম, মৃত্যু ও নাগপুরের ধম্ম প্রবর্তন দিন (১৪ অক্টোবর) স্মরণে প্রতিবছর প্রায় ৫ লাখ লোক মুম্বইয়ের চৈত্যভূমিতে সমবেত হয়। সেখানে কয়েকহাজার বইয়ের দোকান বসে– তাঁর এবং তাঁর ওপরে লেখা বই বিক্রি হয়। অনুসারীদের জন্য তাঁর বাণী ছিল: 'শিক্ষিত হও, সংগঠিত হও, আন্দোলন কর।' ১৯৯০ সালে তাঁকে মরণোত্তর ভারতের সর্বোচ্চ উপাধি *ভারতরত্ন* দেওয়া হয়। তাঁর সম্মানে বহু সরকারি প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করা হয়– যেমন হায়দ্রাবাদের ড. বাবাসাহেব আম্বেদকর ওপেন ইউনিভার্সিটি, অন্ধ্র প্রদেশের শ্রীকাকুলাম ড. বি আর আম্বেদকর ইউনিভার্সিটি, মুজাফ্ফরপুরের বি আর আম্বেদকর বিহার ইউনিভার্সিটি এবং জলন্ধরের বি আর আম্বেদকর ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি, ও নাগপুরের ড. বাবাসাহেব আম্বেদকর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর। ভারতের সংসদ ভবনে আম্বেদকরের একটি বিশাল প্রতিকৃতি রয়েছে।

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে তাঁর সামাজিক-রাজনৈতিক চিন্তাধারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ সম্মান অর্জন করে। তাঁর যুগান্তকারী পদক্ষেপ অনেক মানুষের জীবনে প্রভাব ফেলেছে এবং আজকের ভারতকে তার আর্থ-সামাজিক ও নৈতিক অভিপ্রায় অনুযায়ী বিচক্ষণতার সঙ্গে চলতে সাহায্য করেছে। হিন্দু ধর্মের বর্ণপ্রথার সমালোচনা যেমন তাঁকে বিতর্কিত করে তোলে, তেমনি তাঁর বৌদ্ধ ধর্মে ধর্মান্তরিত হওয়ার বিষয়টি ভারতে ও বিদেশে বৌদ্ধ দর্শনের পুনর্জাগরণের সৃষ্টি করে।

অন্ত্যজশ্রেণির মানুষদের পাশাপাশি জ্যোতিরাও ফুলের মত সামাজিক কর্মী ও পণ্ডিতদের অনেকে মনে করেন, অন্ত্যজদের প্রতি ব্রিটিশদের নিরপেক্ষ নীতিমালা অব্যাহত থাকায় ভারতে অনেক কুসংস্কার দূর করা সম্ভব হয়েছিল। অনেকে মনে করেন, ভারতে দলিত সমাজের জন্য আম্বেদকরের 'আসন সংরক্ষণ নীতি'র আজ আর প্রয়োজন নেই।ৎ

ইন্টারনেট থেকে সংকলন ও অনুবাদ
মানসী চৌধুরী

ড. ভীমরাও আম্বেদকর
জীবন ও সময়

নরেন্দ্র যাদব

শ্রদ্ধাঞ্জলি

অনুসারীদের মাঝে বাবাসাহেব আম্বেদকর নামে সম্বোধিত ভারতরত্ন ড. ভীমরাও রামজী আম্বেদকর নিঃসন্দেহে ভারতের অন্যতম উজ্জ্বল সন্তান। তিনি ১৯২০-র দশকে ভারতের সামাজিক-রাজনৈতিক দৃশ্যপটে প্রবেশ করেন এবং ব্রিটিশ শাসনাবসানের চূড়ান্ত দশকগুলোতে ভারতের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক রূপান্তরে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪৭ সালে ভারতে ব্রিটিশ শাসনাবসানের পর স্বাধীন ভারতের সংবিধান রচনার দায়িত্ব তাঁর ওপর বর্তায়। আম্বেদকর ছিলেন এক মহান সমাজ সংস্কারক, মানবাধিকার প্রবক্তা এবং ভারতের দলিত সমাজের মুক্তিদাতা। যিনি আধুনিক ভারতের সামাজিক বিবেক জাগ্রত করার জন্যে তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন।

আম্বেদকরের জীবন এক অবিশ্বাস্য রূপকথা; অস্পৃশ্য সমাজে জন্মগ্রহণকারী বালকটির শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত কাটে ভয়াবহ প্রতিকূলতার মধ্যে, সকল প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে তিনি লাভ করেন উচ্চশিক্ষা– যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ এবং পিএইচ ডি, লন্ডনের স্কুল অফ ইকোনমিক্স থেকে ডি এসসি, সঙ্গে গ্রে'স ইন্ থেকে বার অ্যাট-ল ডিগ্রি। ভারতে ফিরে তিনি জাত-পাতের পুরনো রীতি ভেঙে ফেলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন, যে জাত-পাত যাবতীয় অন্যায় ও মানবাধিকারের লঙ্ঘন।

পারিবারিক সৌভাগ্য কিংবা রাজনৈতিক আশীর্বাদ ব্যতিরেকে শুধু অদম্য মনোবল ও কঠোর পরিশ্রম সম্বল করে অসীম সাহস ও নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের মাধ্যমে তিনি প্রতিকূল রাজনৈতিক বিরোধিতার মোকাবেলা করে, জাত-পাতের নিগড় থেকে বেরিয়ে স্বাধীন ভারতের সংবিধানের প্রধান নির্মাতা হতে পেরেছিলেন। তারপর তিনি এক অধিকতর ন্যায়ানুগ সমাজ প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করেন যে সমাজে নীচুতলার মানুষদের জন্য থাকবে সামাজিক ন্যায় বিচার। এভাবে তিনি ভারতে সামাজিক সাম্য ও যুক্তিশীলতার এক নতুন যুগের সূচনা করেন। এই প্রক্রিয়ায় আম্বেদকর শুধু যে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রথম সারির নেতা হিসেবে পরিগণিত হলেন তা নয়, তিনি আধুনিক ভারতের বিবেকের পরশপাথর হিসেবে আবির্ভূত হলেন।

ভারতে ড. আম্বেদকরের যে-সব মূর্তি রয়েছে, তার অধিকাংশেই দেখা যায়, নীল স্যুট ও লাল টাইয়ে সুসজ্জিত দৃঢ়পুরুষ বগলে একটি বই নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন– বইটি অবশ্যই ভারতের সংবিধান। এরকম মূর্তি ভারতের সর্বত্রই দেখা যায়, গ্রামে-শহরে, বিশেষত রাস্তার মিলনমুখে। প্রত্যেক বছরের ৬ ডিসেম্বর (আম্বেদকরের মৃত্যু বার্ষিকীতে) প্রায় ২০ লাখ আম্বেদকরপন্থী মুম্বইয়ের চৈত্যভূমিতে জড় হন তাঁদের প্রিয় নেতার প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে, যাঁকে তাঁরা ত্রাণকর্তা হিসেবে পূজা করেন। এটা মোটেই আশ্চর্যের নয় যে, ২০১২ সালে কয়েকটি টেলিভিশন চ্যানেল পরিচালিত বৈদ্যুতিন ভোটে আম্বেদকর 'গান্ধীর পর মহত্তম ভারতীয়' হিসেবে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছেন।

এসব ঘটনার আলোকে আম্বেদকরকে শুধু অস্পৃশ্য বা দলিতদের নেতা হিসেবে চিহ্নিত করাটা বড় ধরনের অন্যায় হবে, যদিও সমাজের দায়িত্বশীল মহল থেকে তেমনটিই করা হয়ে থাকে। আম্বেদকর শুধু অস্পৃশ্যদের নেতা নন, নন শুধু নির্যাতিত মানুষের নেতা। তিনি জাতীয় নেতা। তাঁর পাণ্ডিত্য, তাঁর গণআন্দোলন এবং সরকারে এবং সরকারের বাইরে তাঁর ভূমিকায় এটা সুস্পষ্ট যে তিনি উঁচু মাপের একজন দেশপ্রেমিক।

ঘটনাবহুল জীবনে পণ্ডিত, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক হিসেবে, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্বের একজন প্রাপ্ত ব্যক্তি হিসেবে, আইনপ্রণেতা ও প্রশাসক হিসেবে, সাংসদ হিসেবে, ভারতীয় সংবিধান রচনার প্রধান কারিগর ও আইনজ্ঞ হিসেবে আম্বেদকর অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করেছেন।

রাষ্ট্রনায়ক ও গণমানুষের নেতা হওয়া সত্ত্বেও আম্বেদকর বিপ্রতীপ চিন্তাবিদ ও তীক্ষ্ণধী পণ্ডিত হিসেব চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। তিনি ছিলেন সৃষ্টিশীল লেখক। ভারতে তাঁর মত আর কোন জননেতা এত অধিক লেখালেখি করেননি। সার্বক্ষণিক লেখকের পক্ষেও প্রায় অচিন্তনীয় সংখ্যক বই তিনি লিখে গেছেন: সম্পূর্ণ ও প্রকাশিত ২২টি বই ও নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর প্রবন্ধ, বিভিন্ন পর্যায়ে অসম্পূর্ণ আরো ১০টি বই, ১০টি গবেষণাপত্র ও পুস্তক সমালোচনা ছাড়াও মারাঠি ভাষার বিভিন্ন পাক্ষিক সংবাদপত্রে শত শত প্রবন্ধ-নিবন্ধ।

আম্বেদকরের রচনার ব্যাপ্তিও একইসঙ্গে বিস্ময় উদ্রেককারী। রাজনীতি নিয়ে: ১১টি বই ও নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর প্রবন্ধ যেমন *পাকিস্তান অর দি পার্টিসান অফ ইন্ডিয়া* (১৯৪০), *হোয়াট গান্ধী এন্ড কংগ্রেস হ্যাভ ডান টু আনটাচেবলস* (১৯৪৫); চিরায়ত বই যেমন *ফেডারেশন ভার্সেস ফ্রিডম* (১৯৩৯), *রানাডে, গান্ধী এন্ড জিন্নাহ্* (১৯৪৩); *স্টেটস এন্ড মাইনোরিটিস* (১৯৪৭) এবং *থটস্ অন লিঙ্গুইস্টিক স্টেটস* (১৯৫৫); অর্থনীতির ওপর দু'টি যুগান্তকারী বই– *দি ইভোলিউশন অফ প্রভিনশিয়াল ফাইন্যান্স ইন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া* (১৯১৭) এবং *দি প্রব্লেম অফ দি রুপি; ইটস্ অরিজিন এন্ড ইটস সলিউশন* (১৯২৫); সমাজতন্ত্রের ওপর কালজয়ী অবদান যেমন *এনিহিলেশন অফ কাস্ট* (১৯৩৬), এছাড়াও বর্ণপ্রথার ওপর একটি অবিস্মরণীয় রচনা, *কাস্টস্ ইন ইন্ডিয়া: দেয়ার জেনেসিস, মেকানিজম এন্ড ডেভেলপমেন্ট* (১৯১৮); নৃতত্ত্বের ওপর দু'টি চিন্তা উদ্রেককারী বই– *হু ওয়ার দি শূদ্রস্* (১৯৪৬) এবং *দি আনটাচেবলস: হু ওয়ার দে এবং হোয়াই দে বিকেম আনটাচেবলস্* (১৯৪৮) এবং শেষে ধর্মের ওপর ম্যাগনাম ওপাস: *বুদ্ধ এন্ড হিস ধম্ম*।

আম্বেদকর প্রচুর বক্তৃতাও করেছিলেন। ৫৩৭টি বক্তৃতা– আঞ্চলিক, জাতীয়, আন্তর্জাতিক, সব বিষয়েই তাঁর বক্তৃতায় সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় বিভিন্ন প্রসঙ্গ স্থান পেয়েছে। রাজনীতি ছাড়াও কথা বলেছেন আইন ও সংবিধান নিয়ে। যে-সব জায়গায় তিনি বক্তব্য রেখেছেন,তার মধ্যে রয়েছে বোম্বে প্রভিন্স লেজিসলেটিভ কাউন্সিল, (এবং পরে) বোম্বে লেজিসলেটিভ এসেম্বলি, রাউন্ড টেবিল কনফারেন্স (লন্ডনে ব্রিটিশ সরকার আয়োজিত ভাইসরয়-এর নির্বাহী পরিষদে শ্রমিক নেতা সদস্য হিসেবে), সেন্ট্রাল লেজিসলেটিভ এসেম্বলি (স্বাধীন ভারতের প্রথম আইনমন্ত্রী হিসেবে), কনস্টিটুয়েন্ট এসেম্বলি (ভারতীয় সংবিধানের খসড়া প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে) এবং পার্লামেন্টে (রাজ্যসভায় বিরোধী দলের সদস্য হিসেবে)। এছাড়াও আম্বেকর বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোধা নেতা হিসেবে অসংখ্য জনসভায় বক্তৃতা করেছেন।

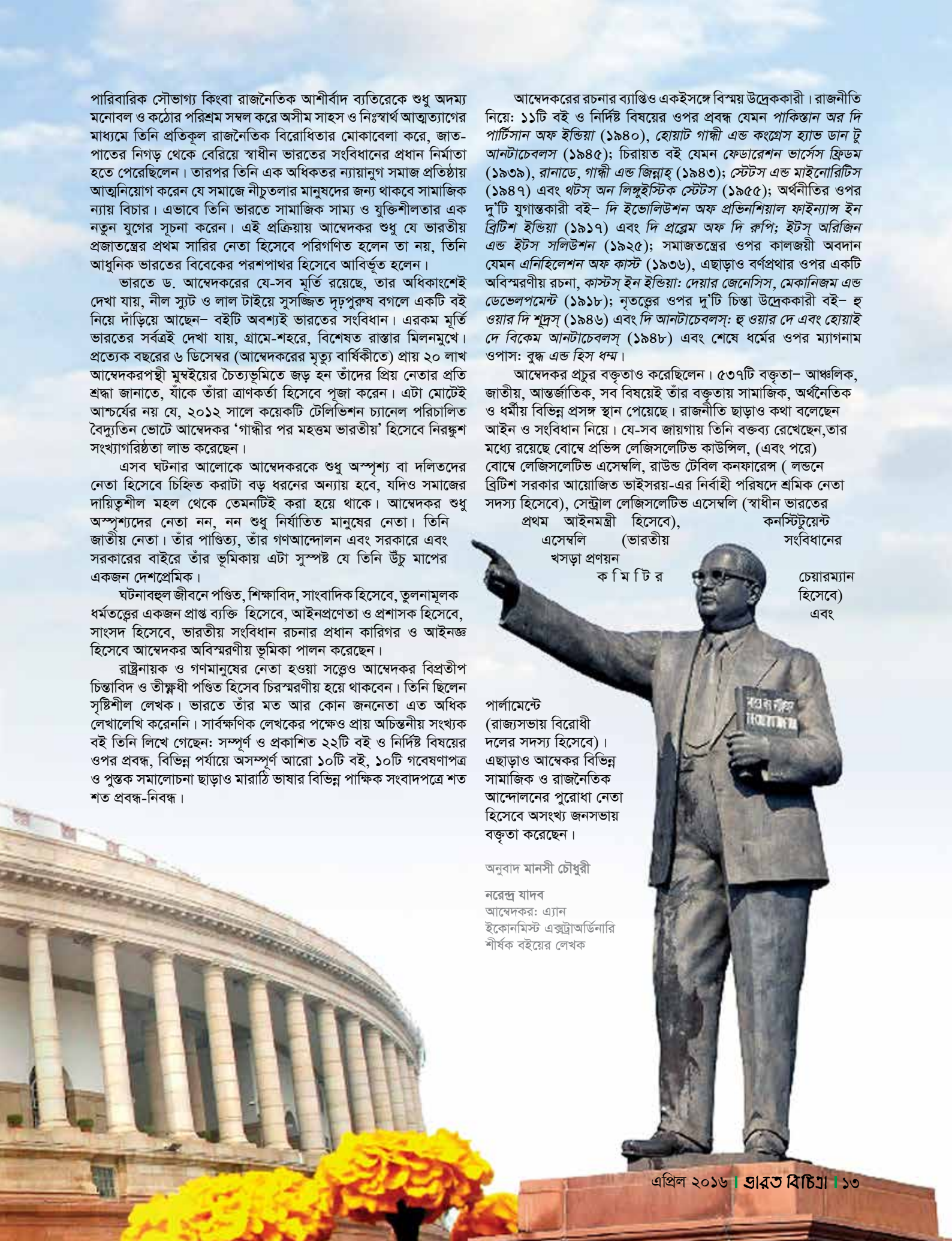

অনুবাদ **মানসী চৌধুরী**

নরেন্দ্র যাদব
আম্বেদকর: এ্যান ইকোনমিস্ট এক্সট্রাঅর্ডিনারি শীর্ষক বইয়ের লেখক

শ্রদ্ধাঞ্জলি

গুগল্ সার্চে দেখা গেছে, জাতির পিতা মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ও প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর পর তৃতীয় ভারতীয় সর্বাধিক জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ড. বি আর আম্বেদকর। অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, দিল্লি, পুদুচেরি, গুজরাট, উত্তরাখণ্ড, হরিয়ানা, রাজস্থান, কর্নাটকের লক্ষকোটি দলিত মানুষের কাছে বাবাসাহেব নামে সমধিক পরিচিত। এই মানুষটি ছিলেন ভারতের অস্পৃশ্যদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনের পুরোধা পুরুষ। তাঁর জীবন এক অবিশ্বাস্য রূপকথা। অস্পৃশ্য সমাজে জন্মগ্রহণকারী এই মানুষটির শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত কাটে ভয়াবহ প্রতিকূলতার মধ্যে, সকল প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে তিনি লাভ করেন উচ্চশিক্ষা– যুক্তরাষ্ট্রের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এ এবং পিএইচ ডি, লন্ডনের স্কুল অফ ইকোনমিক্স থেকে ডি এসসি, সঙ্গে গ্রে'স ইন্ থেকে বার অ্যাট-ল ডিগ্রি।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

১৯৪৭ সালে ১৫ আগস্ট ভারতের স্বাধীনতার প্রথম প্রহরে নবগঠিত কংগ্রেস সরকার আম্বেদকরকে দেশের প্রথম আইনমন্ত্রী পদে বরণ বরে নেয়, যা তিনি সানন্দে গ্রহণ করেন। ২৯ আগস্ট আম্বেদকরকে সংবিধান খসড়া কমিটির সভাপতি করা হয়। এ কাজে তিনি তাঁর সহপাঠী ও সমকালীন পর্যবেক্ষকদের কাছ থেকে প্রচুর প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন। প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্ঘ চর্চাবিষয়ে তাঁর ব্যাপক পড়াশোনা একাজে সহায়ক হিসেবে কাজ করে। ব্যালটের মাধ্যমে ভোট প্রদান, তর্ক-বিতর্ক ও অগ্রবর্তী নীতিমালা, করণীয় বিষয়সূচি, সভা-সমিতি ও ব্যবসায় সংক্রান্ত প্রস্তাবনাসমূহের ব্যবহার ইত্যাদি সংঘ চর্চার অনুষঙ্গ ছিল। প্রাচীন ভারতের কিছু রাষ্ট্রীয় প্রজাতান্ত্রিক উপজাতিগোষ্ঠী যেমন শাক্যবংশ ও লিচ্ছবিরা সংঘ চর্চার সূচনা করেন। অতঃপর আম্বেদকর তাঁর সাংবিধানিক অবয়ব তৈরিতে পশ্চিমা প্রণালীর ব্যবহার করেন।

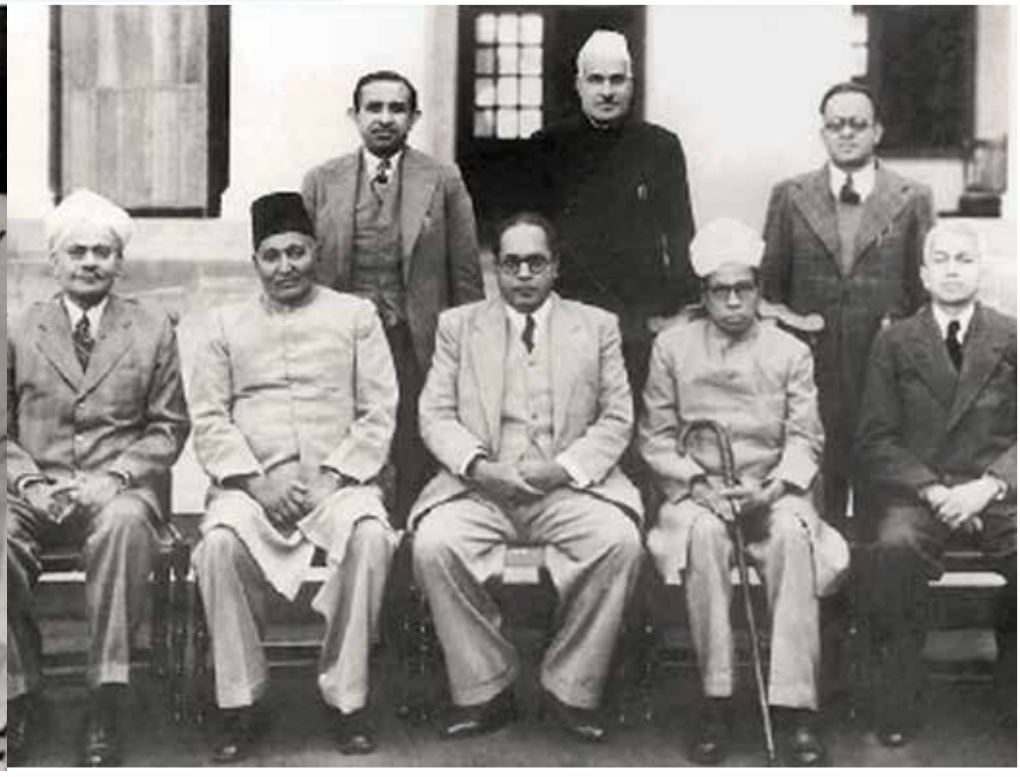

শ্রদ্ধাঞ্জলি

বিশ্লেষণী ক্ষমতার অধিকারী পরিকল্পনাবিদ

নরেন্দ্র যাদব

ভারতের অর্থনীতিবিষয়ক চিন্তায় ড. ভীমরাও আম্বেদকরের অবদান ব্যাপক ও বৈচিত্র্যময়, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তাঁর চিন্তাধারা বহুমাত্রিকও বটে। তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ অবদানের বর্ণনা করতে গেলে যেমন *এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ফাইন্যান্স অফ দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি* এবং *দি ইভোলিউশন অফ প্রভিনশিয়াল ফাইন্যান্স ইন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া* পড়বে পাবলিক ফাইন্যান্স বিভাগে, অন্যদিকে *দি প্রব্লেম অফ দি রুপি: ইটস্ অরিজিন এন্ড ইটস্ সলিউশন*কে মুদ্রাবিষয়ক অর্থনীতি ও আন্তর্জাতিক ফাইন্যান্স বিভাগে বিবেচনা করতে হবে। খোটি ব্যবস্থা ও মহর বতন বিলোপে তাঁর ভূমিকার জন্য তিনি একদিকে যেমন ফলিত কৃষি অর্থনীতিবিদ হিসেবে পরিগণিত হন, অন্যদিকে শিল্পের শ্রমিকদের স্বার্থরক্ষায় তাঁর সংগ্রামের জন্য তিনি বিশিষ্ট শ্রমিক নেতার মর্যাদা লাভ করেন। ভারতের সামাজিক বৈষম্যের অর্থনৈতিক ধারা যেমন শ্রেণিব্যবস্থা ও অস্পৃশ্যতা বিষয়ে তাঁর তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ তাঁকে যেমন অর্থনীতি ও সমাজনীতির মিশ্রণে এক অনন্য অবস্থান দিয়েছে, তেমনি অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভারতের কৌশলবিষয়ক প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ তাঁকে ভারতবিষয়ক পরিকল্পনাকারীদের মূল ব্যক্তিত্বে পরিণত করেছে।

খোট পরিবারে জন্মগ্রহণকারী তিলক খোটদের অধিকার রক্ষায় ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হন কিন্তু খোটদের হাতে গ্রামের গরীব জনসাধারণের বঞ্চনার কথা তিনি একবারও ভাবেননি। অপরদিকে আম্বেদকর গ্রামের গরীব মানুষদের মুক্তি কামনায় খোটদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। লোকমান্য তিলক স্বরাজের ওপর গুরুত্বারোপ করেন, অপরদিকে আম্বেদকর সু-রাজের জন্যে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। এই হচ্ছে তাঁদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য।

আম্বেদকরের একাডেমিক অবদানের উল্লেখযোগ্য দিক

তাঁর প্রথম বই *এ্যাডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ফাইন্যান্স অফ দি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি*, যেখানে ১৭৯২ থেকে ১৮৫৮ সাল পর্যন্ত কালখণ্ডে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রশাসনিক ও আর্থিক পরিবর্তনের ঐতিহাসিক পর্যালোচনা রয়েছে, সেখানে ব্রিটিশরা ভারতীয় জনগণের ওপর কী ধরনের নির্যাতন-নিপীড়ন চালিয়েছে, তার একটা বিশ্বস্ত বর্ণনা রয়েছে।

আম্বেদকর মনে করতেন, কোন দেশের অর্থনীতিকে সেদেশের উন্নয়নমূলক কাজ যেমন গণপূর্ত (অর্থাৎ রেলওয়ে, সড়ক, খাল খনন ইত্যাদি) বিষয়ে ব্যয়ের দৃষ্টিভঙ্গীতে বিচার করা উচিত। তিনি দেখিয়েছেন, ১৮৩৪-৪৮ সালে ইংল্যান্ডের এক ম্যানচেস্টার শহরে জলের জন্য যে বিপুল অর্থ ব্যয় করা হয়েছে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গোটা ভারতে গণপূর্ত বিভাগে তার চেয়ে খরচ করেছে অনেক কম। ভারতবাসীদের প্রতি ব্রিটিশদের বৈষম্যের চিত্র তিনি বইটিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। আবার ১৮৫৮ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বিলুপ্তির পর তথাকথিত ভারতীয় ঋণের বোঝা গরীব ভারতবাসীর কাঁধেই চাপানো হয়েছে, যাদের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠনে, কী এর কার্যক্রমে কার্যত কোন ভূমিকাই ছিল না। আম্বেদকর তাঁর বিশ্লেষণের উপসংহার টেনেছেন এভাবে যে ইংল্যান্ডের প্রতি ভারতের অপরিসীম অবদানের তুলনায় ভারতের প্রতি ইংল্যান্ডে অবদান বলতে গেলে 'কিছুই না'। নির্যাতিত-নিপীড়িত ভারতবাসীর প্রতি আম্বেদকরের উদ্বেগ আরো প্রকটিত হয়েছে তাঁর একই ধরনের আরেকটি বইয়ে– *দি ইভোলিউন অফ প্রভিনশিয়াল ফাইন্যান্স ইন ব্রিটিশ ইন্ডিয়া*। এতে যেমন ১৮৩৩ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারতের কেন্দ্র-রাজ্য অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিবর্তনের চিত্র আছে, তেমনি ত্রুটিপূর্ণ অর্থ ব্যবস্থার বর্ণনা রয়েছে। এই ত্রুটিপূর্ণ অর্থ ব্যবস্থায় তিনি বিভিন্ন ক্ষতিকর ট্যাক্স (যেমন ভূমি, লবণ ও প্রথা ট্যাক্স) এবং অনুৎপাদনশীল ও অপরিণামদর্শী খরচ (যেমন শিক্ষা বা জনকল্যাণে অর্থব্যয়ের পরিবর্তে ইউরোপীয়দের সামরিক বাহিনিতে চাকরি প্রদান)-এর চিত্র তুলে ধরেছেন।

পরবর্তীকালে আম্বেদকর যখন তাঁর প্রতিনিধিত্বশীল বই *প্রবলেম অফ দ্য রুপি* লিখলেন, সেখানে তিনি ১৮০০ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত ভারতীয় রুপির বিবর্তনের ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ তুলে ধরলেন যার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল ভারতের সাধারণ মানুষ। সেই ধারণামূলক বিশ্লেষণে ভারতের জন্য আদর্শ মুদ্রা বেছে নেওয়ার বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

সে-সময়কার জন মেনার্ড কিনেস ও অন্যান্য প্রধান অর্থনীতিবিদদের মতে 'স্বর্ণ বিনিময় আদর্শ'কে ভারতের জন্য আদর্শ মুদ্রা বিনিময় হিসেবে ধরা হচ্ছিল এর সহজ রূপান্তরযোগ্যতার কথা বিবেচনা করে। তাঁদের মতে, 'স্বর্গ বিনিময় আদর্শ'র আওতায় অর্থনীতিতে তারল্য সৃষ্টি স্বর্ণের প্রাপ্যতার মাধ্যমে বাধাগ্রস্ত হবে না এবং বিনিময়ের ক্ষেত্রে গড় রূপান্তরযোগ্যতা দেশের ভবিষ্যৎ উন্নয়নের জন্য ঈপ্সিত। আম্বেদকর 'স্বর্ণ বিনিময় আদর্শ'র রূপান্তরক্ষমতাকে আমলে নিয়েও একে মিশ্রফলদায়ী বলে বর্ণনা করলেন। তিনি কিছু নির্ণায়কের প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্বারোপ করলেন যার দ্বারা প্রচলনকারীর বাধা অপসারিত হয়ে মুদ্রা চলাচল নিয়মিত হয়। তাঁর মতে, 'স্বর্ণ বিনিময় আদর্শ' সে ধরনের কোন নিয়ামক দেয় না, অতএব অপরিমিত তারল্যের সৃষ্টি হবে, মুদ্রাস্ফীতি ঘটবে, যা আর্থ-সামাজিক স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করবে এবং গরীবদের সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

আম্বেদকরের গণ-আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ

খোটি ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আম্বেদকরের সফল সংগ্রামের ফলে চরম অর্থনৈতিক বঞ্চনা থেকে গ্রামের বিপুল দরিদ্র জনগোষ্ঠী মুক্তিলাভ করে। মহর বতনের বিরুদ্ধে তাঁর সফল বিক্ষোভের ফলে কার্যত ক্রীতদাসত্ব থেকে গ্রামের বিপুলসংখ্যক দরিদ্র নির্যাতিত মানুষ মুক্তি লাভ করে। দাদন ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে তাঁর আনীত বিলের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র ও নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর ওপর যে অবিচার চলছিল, তার অবসান ঘটে। তাঁর কিছু পূর্বেকার জাতীয় নেতা বাল গঙ্গাধর তিলকের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য থেকে অবহেলিত নীচুতলার মানুষদের প্রতি তাঁর সমবেদনার ব্যাখ্যা পাওয়া যেতে পারে। ১৯০৩ সালে ব্রিটিশ সরকার জমিদার খোটদের অধিকার খর্ব করার লক্ষ্যে এতদ্‌সংক্রান্ত আইনে একটি সংশোধনী আনার উদ্যোগ নেয়– তিলক তাঁর তীব্র বিরোধিতা করেন। এর আগে ১৮৯৯ সালে ব্রিটিশ সরকার যখন খোটদের কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে উদ্যোগ নিতে শুরু করেন, তিলক তাঁর *দৈনিক কেশরী*তে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে খোটদের সমর্থন করে ধারাবাহিকভাবে প্ররোচনামূলক নিবন্ধ লিখতে থাকেন। খোট পরিবারে জন্মগ্রহণকারী তিলক খোটদের অধিকার রক্ষায় ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে লিপ্ত হন কিন্তু খোটদের হাতে গ্রামের গরীব জনসাধারণের বঞ্চনার কথা তিনি একবারও ভাবেননি। অপরদিকে আম্বেদকর গ্রামের গরীব মানুষদের মুক্তি কামনায় খোটদের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলেন। লোকমান্য তিলক স্বরাজের ওপর গুরুত্বারোপ করেন, আম্বেদকর সু-রাজের জন্যে সংগ্রামে অবতীর্ণ হন। এই হচ্ছে তাঁদের মধ্যে দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্য।

শিল্প ক্ষেত্রে আম্বেদকর দেখলেন, বিদ্যমান শ্রমিক ইউনিয়নসমূহ আপাত শ্রমিকদের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে নিয়োজিত কিন্তু অস্পৃশ্য শ্রমিকদের তারা মানুষ বলে গণ্য করছে না– তাদের অধিকার রক্ষায় তারা নীরব। আম্বেদকর ১৯৩৬ সালে একটি শ্রমিক দলের প্রতিষ্ঠা করেন যা মূলধারার কমিউনিস্ট নেতৃত্বাধীন শ্রমিক আন্দোলনের থেকে আলাদা। প্রকৃতপক্ষে, আম্বেদকরের প্রতিষ্ঠিত 'স্বাধীন শ্রমিক দল'-এর গঠনতন্ত্র আজও অনন্য এবং ভারতের বঞ্চিত-নিপীড়িতদের সমস্যা তুলে ধরায় বিশিষ্টতার দাবি করতে পারে। এটি পবরর্তীকালের ২০ দফা অর্থনৈতিক কর্মসূচিসহ ভারতের দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচিসমূহের পথ-নির্দেশক।

অর্থনীতিবিদ হিসেবে আম্বেদকরের অবদানের সুনির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সামাজিক বৈষম্য যেমন সমাজের বর্ণপ্রথা ও অস্পৃশ্যতার অর্থনৈতিক মাত্রার ধারণামূলক বিশ্লেষণ। বর্ণপ্রথাকে যখন সময়-চিহ্নিত অর্থনীতির নিয়ম হিসেবে মানা হচ্ছিল, উদাহরণস্বরূপ শ্রমবিভাজনের কথা বলা যেতে পারে, আম্বেদকর তাঁর *এনিহিলেশন অফ কাস্ট* বইয়ে তীব্র ভাষায় এর সমালোচনা করলেন। আম্বেদকর বললেন, চতুর্বর্ণে যে শ্রমবিভাজনের কথা বলা হয়েছে তা স্বতঃস্ফূর্ত নয়, প্রাকৃতিক ঝোঁকের ওপর ভিত্তি করেও হয়নি কিংবা পছন্দের ভিত্তিতেও হয়নি। এখানে ব্যক্তির অনুভূতি, ব্যক্তিবিশেষের পছন্দের কোন জায়গা নেই। এটা নিয়তির ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। তিনি ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থাকে একটি টাওয়ারের সঙ্গে তুলনা করেন, যেখানে অনেক তলা রয়েছে কিন্তু কোন সিঁড়ি নেই। তিনি বলেন, এই ব্যবস্থায় মেঝেতে পড়ে একজন মরবে, সেখানেই আরেকজন জন্মাবে। আম্বেদকর বলেন, বর্ণপ্রথা নিঃসন্দেহে একটা শ্রেণিবিভক্ত সমাজ যেখানে শ্রমবিভাজন একজনের ওপর আরেকজনের অবস্থান নির্দেশ করে। তিনি বলেন, সভ্য সমাজে শ্রমবিভাজনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু কোন সভ্য সমাজে এমন প্রকৃতিবিরুদ্ধ নিশ্ছিদ্র শ্রমিক বিভাজন নেই।

আম্বেদকরের বর্ণপ্রথাকে আক্রমণ তথাকথিত উচ্চশ্রেণীর কর্তৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করা ছিল না, ছিল অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের বৃহত্তর স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। আম্বেদকর বলেন যে, বর্ণপ্রথা শ্রম ও পুঁজির চলন হ্রাস করেছে। তিনি বলেন, পছন্দ করার ক্ষমতার ক্ষেত্রে এবং নিজের কেরিয়ার গড়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তিবিশেষের যোগ্যতা বাড়াতে সামাজিক ও ব্যক্তিগত দক্ষতার প্রয়োজন। এই নীতি বর্ণপ্রথায় এ পর্যন্ত উপেক্ষিত হয়েছে। কারণ এর উদ্ভব হয়েছে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মৌল সামর্থ্যের ওপর ভিত্তি করে নয়, বরং বাবা-মায়ের সামাজিক মর্যাদার ওপর ভিত্তি করে নির্বাচিত ব্যক্তিবিশেষকে আগে থেকে কোন কাজে নিযুক্ত করার চেষ্টা থেকে।

আম্বেদকরের মতে, বর্ণপ্রথা ভারতের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত করেছে। বর্ণপ্রথা শ্রমের ও পুঁজির চলন বাধাগ্রস্ত করেছে যা উৎপাদন প্রক্রিয়ায় অদক্ষতার জন্ম দেয়। আর এর ফলে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাধাগ্রস্ত হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনে অবিরাম পরিবর্তন আনে। অপরদিকে বর্ণপ্রথা প্রচলিত সামাজিক-অর্থনৈতিক গঠনের চিরন্তনতার কথা বলে যা কিনা অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

স্টেটস্ এন্ড মাইনোরিটিস্ গ্রন্থে আম্বেদকর প্রকৃতপক্ষে ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি কৌশল বাৎলে দেন। এই কৌশল 'ব্যক্তিগত উদ্যোগের প্রতিটি পথ খোলা রেখে এবং সম্পদের সুষম বণ্টন করে সর্বোচ্চ উৎপাদনশীলতার লক্ষ্যে জনগণের অর্থনৈতিক জীবনের পরিকল্পনা করতে রাষ্ট্রকে দায়বদ্ধ করে তোলে।'

এমনকি ভারতের সংবিধানকে একটি নৈতিক আলোকবর্তিকা হিসেবে খসড়া প্রণয়ন করবার সময়ও অর্থনীতিক আম্বেদকর অতিমাত্রায় সচেতন ছিলেন। তিনি 'মানবিক সম্পর্কের শাসননীতি' হিসেবে গণতন্ত্রের জোর সুপারিশ করেন। একইসঙ্গে গণতন্ত্রের খুঁটি হিসেবে বিবেচিত সাম্য, স্বাধীনতা ও ভ্রাতৃত্বের নীতিমালার ওপর গুরুত্বারোপ করেন যা শুধুমাত্র রাজনৈতিক অধিকার হিসেবে ক্ষুদ্র অর্থে ব্যাখ্যাত হবে না। তিনি গণতন্ত্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মাত্রার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। একই সঙ্গে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্র না থাকলে রাজনৈতিক গণতন্ত্র সফল হতে পারে না। কনস্টিটুয়েন্ট এসেম্বলিতে বক্তৃতাকালে আম্বেদকর বলেন, তাঁদের সংবিধান তৈরির উদ্দেশ্য হচ্ছে রাজনৈতিক গণতন্ত্রের রূপদান করা। তিনি সংবিধানে অর্থনৈতিক গণতন্ত্র সন্নিবেশিত করার কথা বলেন যা কিনা রাষ্ট্রনীতির নির্দেশক নীতি নামে অভিহিত। ভারতীয় অর্থনৈতিক চিন্তার বিবর্তনে এবং ভারতের অর্থনৈতিক সমস্যাদি মোকাবেলায় আম্বেদকরের অবদান খাঁটো করে দেখার ফল এখন অর্থনৈতিকদর্শনে দৃশ্যমান সুস্পষ্ট। তাঁর নিজের ভাষায় এই দর্শন হচ্ছে: বহুজন হিতায়ঃ, বহুজন সুখায়ঃ।

আম্বেদকরের অর্থনৈতিক দর্শন সামাজিক, ধর্মীয় ও নৈতিক বোধে নিহিত। এই দর্শনের লক্ষ্য হচ্ছে সমাজের নিপীড়িত মানুষ। এই অর্থনৈতিক দর্শন স্বাধীনতা, সমতা ও ভ্রাতৃত্বের ওপর জোর দিয়েছে। তাঁর দর্শনের লক্ষ্য হচ্ছে যারা অবহেলিত তাদের নতুন জীবনদান, যারা সমাজের নীচু তলার মানুষ, তাদের জীবনমান উন্নয়ন এবং বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকল মানুষের জন্য সাম্য, স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা। প্রজ্ঞা, শীল ও করুণার ওপর প্রতিষ্ঠিত একটি বণবৈষম্যহীন গণতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণ তাঁর দর্শনের নির্যাস।

অনুবাদ মানসী চৌধুরী

নরেন্দ্র যাদব
আম্বেদকর: এ্যান ইকোনমিস্ট এক্সট্রাঅর্ডিনারি শীর্ষক বইয়ের লেখক

ভারতীয় সংবিধান

জনগণের, জনগণের জন্য, জনগণের দ্বারা

সুমন্ত বাত্রা

অনেক অসাধারণ বিষয়সহ এক বিশিষ্ট দলিল ভারতীয় সংবিধান পৃথিবীর যে-কোন সার্বভৌম দেশের জন্যে দীর্ঘতম লিখিত সংবিধান। সংবিধানের মূল পাঠ্যে ২২খণ্ড ও ৮ তফসিলে ৩৯৫টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি এটি কার্যকর হয়। ১০০ সংশোধনীসহ এখন এর অনুচ্ছেদ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৪৮-এ।

ভারতীয় জনগণের ভোটে নির্বাচিত প্রভিনশিয়াল এসেম্বলির সদস্যদের নিয়ে গঠিত কনস্টিটুয়েন্ট এসেম্বলি এই সংবিধান রচনা করে। ড. সচ্চিদানন্দ সিনহা ছিলেন কনস্টিটুয়েন্ট এসেম্বলির প্রথম সভাপতি। পরে ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ এর সভাপতি নির্বাচিত হন। ভারতের অনন্য সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বৈচিত্র্য বিবেচনায় রেখে দেশটি কিভাবে পরিচালিত ও শাসিত হবে তার ব্যাপক ও গতিশীল একটি কাঠামো তৈরির উদ্দেশ্যে ড. বি আর আম্বেদকরকে ভারতীয় সংবিধানের খসড়া প্রণয়ন কমিটির সভাপতি মনোনীত করা হয়। তাঁকে ভারতীয় সংবিধানের প্রধান নির্মাতা হিসেবে গণ্য করা হয়। এটি রাষ্ট্রকাঠামোর প্রধান তিন অঙ্গ– নির্বাহী, আইন প্রণয়ন ও বিচার বিভাগ প্রতিষ্ঠা এবং তাদের ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে, দায়িত্বসমূহ উল্লেখ করে এবং পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক কেমন হবে তা নির্ধারণ করে। এই অঙ্গ তিনটি মৌল শাসন পরিচালন কাঠামো এবং সরকারের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক কেমন হবে তা সুনির্দিষ্ট করে। নাগরিকদের অধিকার ও দায়িত্ব সম্পর্কেও এতে বলা হয়। ১৯৫৪ সালের আদেশে সংবিধানের ৩৭০ নং অনুচ্ছেদে বিশেষ ছাড় ও ঈষৎ পরিবর্তনসহ জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যে এটি প্রযোজ্য হয়। এটি দেশের সকল আইনের ধাত্রী। সরকারের কার্যকর প্রতিটি আইনের সঙ্গে সংবিধানের সামঞ্জস্য থাকতে হবে।

সংবিধানের প্রস্তাবনায় ভারতকে এটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র এবং জনগণের জন্য ন্যায়বিচার, মুক্তি ও সমতা নিশ্চিত করার অঙ্গীকারাবদ্ধ একটি কল্যাণমুখী রাষ্ট্র এবং সৌভ্রাতৃত্ব বৃদ্ধি এবং প্রত্যেকের মর্যাদা এবং দেশের ঐক্য ও সংহতি রক্ষার ঘোষণা রয়েছে। ভারতীয় সংবিধানের মৌল কাঠামো সন্নিবেশিত নির্দেশিত লক্ষ্যসমূহে কোন সংশোধনী আনা যায় না। প্রস্তাবনার সূচনা ও শেষ বাক্যগুলি হচ্ছে: 'আমরা ভারতের জনগণ....এই সংবিধানে গ্রহণ, কার্যকর এবং আমাদের নিজেদের প্রদান করছি' জানিয়ে দিচ্ছে যে ক্ষমতা শেষ পর্যন্ত জনগণের হাতেই ন্যস্ত।

যদিও সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১-এ ভারত ইউনিয়ন অফ স্টেটস্ হবে বলা হয়েছে, তবু সংবিধান কেন্দ্র ও রাজ্যসমূহের মধ্যে ক্ষমতা ভাগাভাগিসহ একটা ফেডারেল কাঠামো দিয়েছে এবং রাজ্যগুলির প্রত্যেককে নিজ নিজ কর্মপরিধির মধ্যে কাজ করার ও আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতা দান করেছে। ৭ম তফসিলে তিনটি আইন প্রণয়নসংক্রান্ত তালিকা রয়েছে যাতে প্রশাসনের বিষয়াদি সন্নিবেশিত অর্থাৎ কেন্দ্র, রাজ্য ও উভয়ের সম্মিলিত আইন প্রণয়ন তালিকা। কেন্দ্রীয় তালিকায় নির্দেশিত বিষয়াবলীর ওপর আইন প্রণয়নের বিশেষ ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার ভোগ করবে। রাজ্য তালিকার বিষয়াবলীর ওপর আইন প্রণয়নের পূর্ণ ক্ষমতা রাজ্য সরকারের এবং সম্মিলিত তালিকায় নির্দেশিত বিষয়াদির ওপর কেন্দ্রীয় সরকারের ওপর ন্যস্ত উদ্ভূত ক্ষমতাবলে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়ে আইন প্রণয়ন করবে। ভারতকে ফেডারেশনের সমবায় বলা যেতে পারে। সংবিধান কেন্দ্রে একটি দ্বিকক্ষবিশিষ্ট সংসদীয় কাঠামোর সরকার ব্যবস্থার কথা বলে– লোকসভা (সংসদের নিম্নকক্ষ) এবং রাজ্যসভা (সংসদের উচ্চকক্ষ)। লোকসভা যেমন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত, তেমনি রাজ্যসভা রাজ্য লেজিসলেটিভ এসেম্বলির নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত। রাষ্ট্রপতি হলেন রাজ্য ও সংসদের মনোনীত প্রধান। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের নিয়ে প্রকৃত প্রস্তাবে নির্বাহী প্রধান এবং শাসন পরিচালনার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত।

আইন প্রণয়ন ও নির্বাহ ক্ষমতায় স্বাধীন একটি নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা সংবিধানের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। সুপ্রিম কোর্ট ভারতের সর্বোচ্চ আদালত, সংবিধানের অভিভাবক এবং আপিলের চূড়ান্ত আদালত। প্রত্যেক রাজ্যে এর সর্বোচ্চ আদালত হিসেবে একটি হাই কোর্ট রয়েছে। বিচারিক পর্যবেক্ষণ ক্ষমতায় সুপ্রিম কোর্ট ও হাই কোর্ট কোন আইনকে অসাংবিধানিক ঘোষণা অথবা সংবিধানের কোন বিধান লংঘিত হলে তা তার কর্তৃত্ব বহির্ভূত বলে ঘোষণা করতে পারে। এই বিচারিক পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা একদিক মার্কিন বিচারিক অধিপত্য, অন্যদিকে ব্রিটিশ সংসদীয় আধিপত্যের মধ্যবর্তী পথ। বিচার ব্যবস্থার নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিচারকদের নিয়োগ করা হয় নির্বাহীদের প্রভাবশূন্য প্রক্রিয়ায়। সংসদের উভয়কক্ষের অনুমোদনক্রমে অভিশংসন এনেই কেবল বিচারকদের অপসারণ করা যাবে।

সংবিধান নাগরিকদের অনেক মৌলিক অধিকার দিয়েছে। এগুলো হচ্ছে– ১. সমানাধিকার ২. মুক্তির অধিকার ৩. বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের অধিকার ৪. ধর্মীয় স্বাধীনতার অধিকার, ৫. সাংস্কৃতিক ও শিক্ষাগত অধিকার, ৬. সাংবিধানিক প্রতিকারের অধিকার। এসব অধিকারের জন্য ন্যায়বিচার চাওয়া যেতে পারে এবং এসব অধিকারের যে কোনটির হরণে যে-কেউ সুপ্রিম কোর্ট কিংবা হাই কোর্টের দারস্থ হতে পারে। তবে, ভারতে মৌলিক অধিকার নিরঙ্কুশ নয়। যুক্তিসঙ্গত বিধিনিষেধ আরোপ করা যেতে পারে। ১৯৭৬ সালের ৪২তম সংশোধনীতে জনগণকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় যে, নাগরিক হিসেবে তাদের অধিকার ভোগ করতে হলে তাদের অধিকার ও কর্তব্য পালন পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত।

সংবিধানের আরেকটি অভিনব বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে রাষ্ট্রীয় নীতি পরিচালন-নীতিমালা সংবলিত একটি অধ্যায় রয়েছে, যাতে দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সরকার সে-সব বাস্তবায়নে নির্দেশনা পেতে পারে। যুক্তিগ্রাহ্য না হলেও এসব নীতিমালা দেশ পরিচালনায় অপরিহার্য বলে বিবেচিত হবে।

সংবিধানে অনেক স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, যেমন নির্বাচন কমিশন (অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্বপ্রাপ্ত) এবং একটি অডিটর জেনারেল (সরকার ও এর অধীন সংস্থাসমূহের স্বাধীন অডিট একাউন্টের জন্য)।

সংবিধানের অন্যতম শক্তি হচ্ছে এটি একটি গতিশীল অস্ত্র যা এর ব্যাখ্যা বা সংশোধনীর মাধ্যমে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভূত হতে পারে। কাগজে-কলমে সংবিধানের সংশোধনী একটি জটিল ব্যাপার এবং সংশোধনী পাশ করতে হলে সাধারণত লোকসভা ও রাজ্যসভার দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন লাগে। তবে ভারতের সংবিধান পৃথিবীর অন্যতম পৌনঃপুনিক সংশোধিত সংবিধান যা দেশ ও তার জনগণের প্রবৃদ্ধি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে না।

ভারতের মত বৈচিত্র্যময় ও জটিল দেশের জন্য ভারতীয় সংবিধানের সাফল্য হচ্ছে এটি বিশ্বের তাবৎ বিশেষজ্ঞের কৌতূহল, উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা যুগিয়ে চলেছে।

অনুবাদ মানসী চৌধুরী

সুমন্ত বাত্রা
ভারতের কর্পোরেট ও পলিসি আইনজীবী

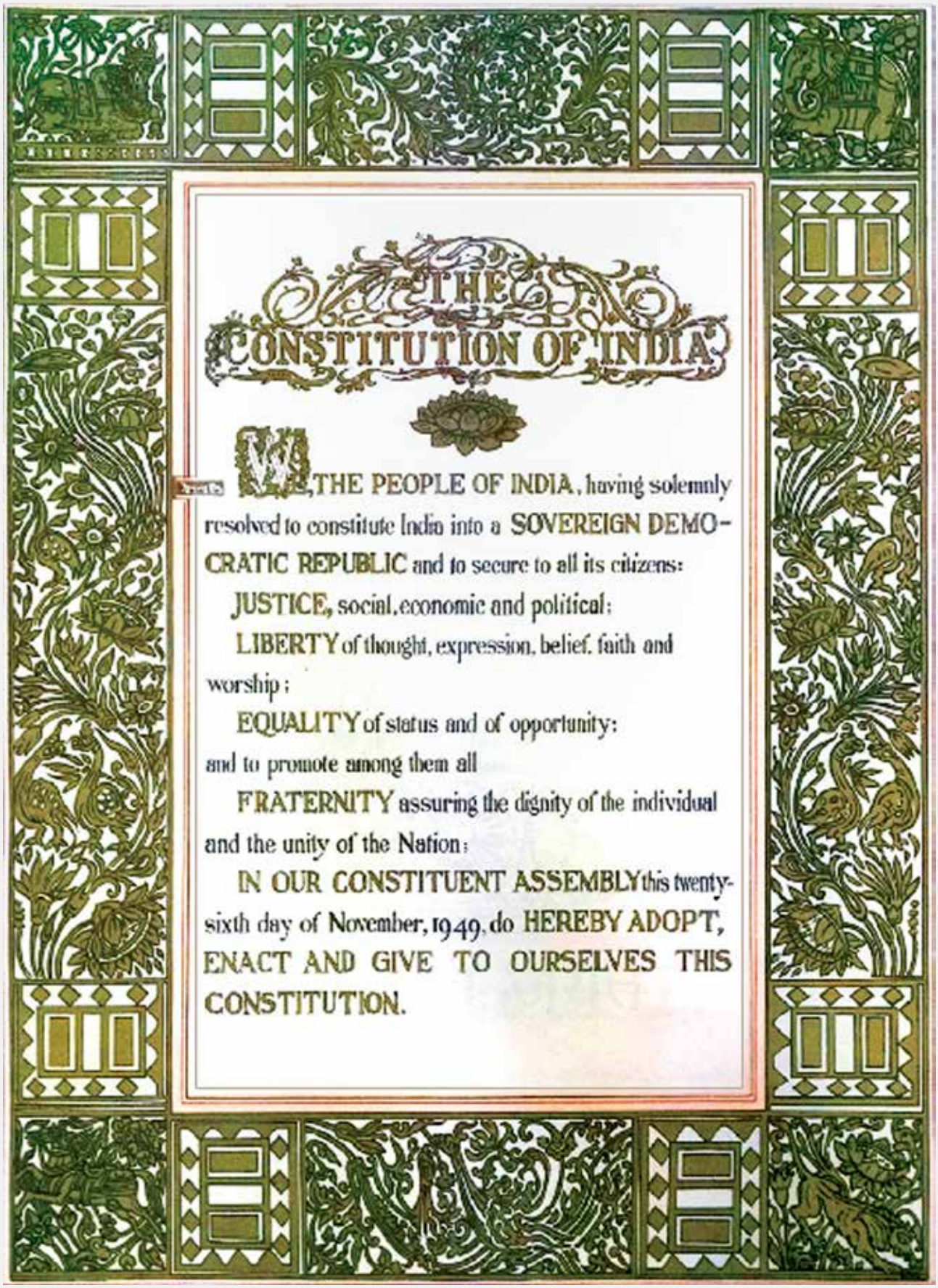
THE CONSTITUTION OF INDIA
WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens:
JUSTICE, social, economic and political:
LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;
EQUALITY of status and of opportunity:
and to promote among them all
FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity of the Nation;
IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this twenty-sixth day of November, 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

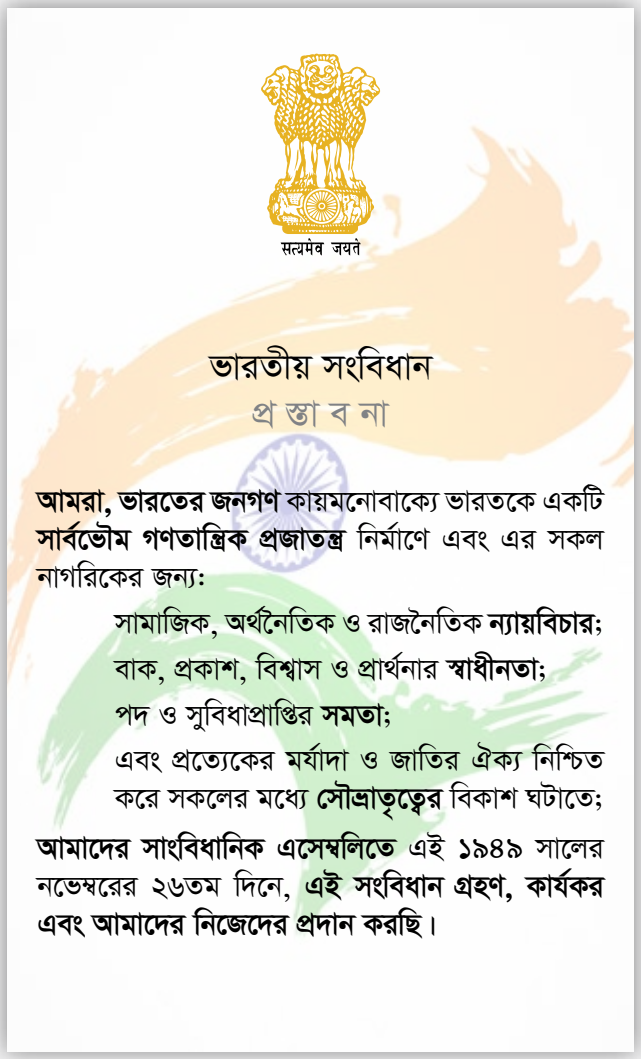

সংবিধান রচনা

৯ ডিসেম্বর, ১৯৪৬ ॥ বর্তমানে কেন্দ্রীয় হল নামে পরিচিত সংসদের কনস্টিটুয়েন্ট হলে প্রথমবারের মত কনস্টিটুয়েন্ট এসেম্বলির সদস্যরা বৈঠকে বসেন।

১৩ ডিসেম্বর, ১৯৪৬ ॥ পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ৮ দফা লক্ষ্য সংবলিত এক প্রস্তাব আনেন যা সংবিধানের রোড ম্যাপ হিসেবে কাজ করে।

১৪ আগস্ট, ১৯৪৭ ॥ মধ্যরাতের প্রথম প্রহরে কনস্টিটুয়েন্ট এসেম্বলি স্বাধীন ভারতের জন্য আইন প্রণয়নের দায়িত্বভার হাতে নেয়। এতে সংবিধানের খসড়া প্রণয়নে মৌলিক অধিকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতাসহ বিভিন্ন প্যানেল গঠনের প্রক্রিয়া শুরু হয়।

২৯ আগস্ট, ১৯৪৭ ॥ সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত করতে ড. আম্বেদকরকে সভাপতি করে ৮-সদস্যের প্যানেল নিয়োগ করা হয়।

৪ নভেম্বর, ১৯৪৭ ॥ বিশ্বের বিভিন্ন সংবিধানের আলোকে কিছু মৌল ভাবনা সংবলিত সংবিধানের খসড়া প্রস্তুত হয়।

১১ ডিসেম্বর, ১৯৪৭ ॥ ড. রাজেন্দ্রপ্রসাদ সংবিধান খসড়া কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। পরে তিনি ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি হন।

২৬ নভেম্বর, ১৯৪৯ ॥ ভারতের সংবিধান অনুমোদিত হয়। এটি ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি কার্যকর হয়।

প্রধান সংশোধনীসমূহ

১৯৫১ অবাধ বক্তব্যদান যৌক্তিক কারণে বন্ধ এবং বিচারক বাছাই থেকে আইনসমূহের রক্ষাকবচ ৯ম তফসিল প্রতিষ্ঠা ছিল প্রথম সংশোধনীর কারণ। ২০০৭ সালে সুপ্রিম কোর্ট সংবিধানের মৌলিক আদর্শের পরিপন্থী আইনসমূহ অপনোদন করা যেতে পারে বলে রুল জারি করে।

১৯৫৬ ভাষাগত বিবেচনায় রাজ্যসমূহের স্বীকৃতিদানের পথ সুগম হয়।

১৯৬০ ৮ম সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত লোকসভা ও রাজ্য এসেম্বলিসমূহে তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি ও এ্যাংলো ইন্ডিয়ানদের আসন সংরক্ষণের মেয়াদ বাড়ানো হয়। প্রত্যেক দশকে এটা পর্যালোচনা করা হয়। ২০০৬ সালে ৯৩তম সংশোধনীতে সরকারি ও বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অন্যান্য পশ্চাদ্‌পদ শ্রেণির জন্যে ২৭% কোটা বরাদ্দ করা হয়।

১৯৬১ দ্বাদশ সংশোধনীর ফলে পর্তুগিজ উপনিবেশ গোয়া, দমন ও দিউ ভারতের অংশে পরিণত হয়। ১৯৭৫ সালে ৩৫তম সংশোধনীর ফলে সিকিম ভারতীয় ইউনিয়নের অংশে পরিণত হয়।

১৯৭১ প্রিন্সলি স্টেটগুলির সাবেক শাসকদের সম্মানীভাতা বন্ধে ২৬তম সংশোধনী আনা হয়।

১৯৭৫ ৩৯তম সংশোধনীটি আসে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর পার্লামেন্ট নির্বাচন বাতিল করে এলাহাবাদ হাই কোর্টের দেওয়া রায় নাকোচ করতে, যার ফলে জরুরি অবস্থা জারি আংশিক বলবৎ হয়।

১৯৭৬ ৪২তম সংশোধনীতে জরুরি অবস্থাকালে হরণকৃত মৌলিক অধিকার, কিছু মৌলিক দায়িত্ব প্রদান এবং সংবিধানের প্রস্তাবনায় ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক শব্দাবলী অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

১৯৭৭-৭৮ ৪৩ ও ৪৪তম সংশোধনী দু'টি জরুরি অবস্থা-পরবর্তী নাগরিক অধিকার পুনরুজ্জীবিত করে এবং মৌলিক অধিকারসমূহের মধ্যে থেকে সম্পত্তি রক্ষার অধিকার রহিত করা হয়।

১৯৮৫ ৫২তম সংশোধনীর বিষয় ছিল দল বদলের ফলে আইন প্রণেতাদের অযোগ্য ঘোষণা।

১৯৮৮ ৬১তম সংশোধনীতে ভোটদানের বয়স ২১ থেকে কমিয়ে ১৮-য় আনা হয়।

১৯৯২ পঞ্চায়েত ও স্থানীয় পুরসভার সরাসরি নির্বাচন প্রদানের ব্যবস্থা করা ছিল ৭২ ও ৭৪তম সংসোধনীর বিষয়।

২০০২ ৮৬তম সংশোধনীতে ১৪ বছর পর্যন্ত শিক্ষা এবং ৬ বছর পর্যন্ত শৈশবকালীন পরিচর্যার অধিকার দান করা হয়।

২০১৪ জাতীয় বিচারিক নিয়োগ কমিশন সৃষ্টি হয় ৯৯তম সংশোধনীতে। ২০১৫ সালে তফসিলি শ্রেণি অপনোদন করা হয়।

অনুবাদ মানসী চৌধুরী

প্রবন্ধ

অমলিন প্রেম পারিজাত

আমিরুল আলম খান

মর্ত্যধামে স্বর্গের একমাত্র পুষ্প নাকি পারিজাত। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, 'পারিজাত স্বর্গের ফুল, অতএব, নামকরণের চেষ্টা অর্থহীন।' দ্বিজেন শর্মা লিখছেন, 'এই বহুপৌষ্পিক অগ্রোন্মুখি মঞ্জরির পরমায়ু দীর্ঘ, সৌন্দর্যে তুলনাহীন।...বসন্তে নিষ্পত্র ডালে ডালে ঝলকে ওঠে আল্‌তা রঙের মঞ্জরি, গাঢ়-লাল, শৈল্পিক পুষ্পসজ্জার মতই দৃষ্টিনন্দন।' বহুদূর থেকে দৃষ্ট। রূপেরও তেমনি বাহার। আমাদের দেশে সর্বত্র প্রচুর পারিজাত জন্মে। যশুরে মানুষের নিকট এই বেহেস্তি ফুলের পরিচয় 'পান্‌সে মান্দার' নামে, দেশের অন্যত্র 'পাল্‌তে মান্দার'। কিন্তু বেড়ে ওঠে নিতান্ত অযত্নে, অবহেলায়। অর্থমূল্য নেই। তাই এই অনাদর। তবু, বসন্তে পারিজাত তার উজ্জ্বল উপস্থিতি ঘোষণা করতে ভোলে না। আত্মরক্ষার সকল অস্ত্র ওর সর্বাঙ্গে। তাই বুঝি ও টিকে আছে বনে-জঙ্গলে। কণ্টক পারিজাতের যেমন আত্মরক্ষার অস্ত্র, তেমনি ওই কণ্টকই ওর সর্বনাশের মূল। কানন সুরক্ষায় উদ্যান আধিকারিকরা পারিজাত দিয়ে প্রাকৃতিক প্রাচীর নির্মাণ করে। বিলাসীর নন্দনকাননে স্থান না পেয়ে কানন রক্ষার দায়িত্ব নিয়েছে পারিজাত। এই স্বর্গচ্যুত পুষ্পের মর্ত্যাগমন বর্ণনায় উচ্ছ্বসিত রবীন্দ্রনাথ,

'অকস্মাৎ দাঁড়াইলে মানবের কুটির প্রাঙ্গণে
পিতাম্বর পরি,
উতলা উত্তরীয় হতে উড়াইয়া উন্মাদ পবনে
মান্দারমঞ্জরি।'

রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশও পারিজাতকে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছেন 'মাদার' বলেই,

'পাশ দিয়ে খল খল করে বয়ে যায় খাল,
তবু ঘুম ভাঙে নাকো একবার ঘুমালে কে উঠে আসে আর
যদিও ডুকারি যায় শঙ্খচিল মর্মরিয়া মরে গো মাদার।'

রবীন্দ্রনাথ পারিজাত নিয়ে গান বেঁধেছেন,

পারিজাতের কেশর নিয়ে
ধরায় শশী ছড়ায় কি এ
ইন্দ্র পুরীর কোন রমণী বাসর প্রদীপ জ্বালে?

নজরুল কাব্যে প্রেমের রূপকল্প পারিজাত,

পরো কুন্তলে, ধরো অঞ্চলে
অমলিন প্রেম পারিজাত।'

তা স্বর্গ থেকে এই স্বর্গীয় পুষ্পের মর্ত্যধামে আগমনের গল্পটা এবার শোনা যাক।

স্বর্গের পারিজাত। সমুদ্র মন্থনে ধরায় ধূলায় আগমন। পারিন্ (সমুদ্র) থেকে জাত (উৎপন্ন) বলে পারিজাত। স্বর্গের পঞ্চ দেবপুষ্পের (মন্দার, পারিজাত, সন্তান, কল্প ও হরিচন্দন) অন্যতম। স্বর্গদেবতা ইন্দ্র এই সুগন্ধী পুষ্পতরুটি পুতেছিলেন তার নন্দন কাননে। এর সুগন্ধে সমস্ত ইন্দ্রপুরী সুগন্ধে ভরে যেত।

ইন্দ্রপত্নী শচীদেবী আর কৃষ্ণপত্নী সত্যভামার পারস্পরিক রেষারেষিতে এই স্বর্গীয় পুষ্পের মর্ত্যধামে আগমন। তার কিছু চুরি আর বাকিটা যুদ্ধজয়ে। পৌরাণিক কাহিনি অনুযায়ী সৌন্দর্যে অদ্বিতীয় এই স্বর্গীয় পুষ্পটি আবার স্বর্গেই ফেরত যাবে যখন কৃষ্ণ তার দ্বারাকাবাস সমাপ্ত করে স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করবেন। ততকাল আমরা মর্ত্যবাসীগণ এই স্বর্গীয় পুষ্প সৌন্দর্য উপভোগ করব।

ইন্দ্রের স্ত্রী শচীদেবীর খুব প্রিয় ছিল এই পারিজাত ফুল। সাজবার সময়য় তিনি রোজ একটি করে পারিজাতমঞ্জরি চুলে পরতেন।

এই পারিজাত একসময় চুরি হয়ে গিয়েছিল। স্বয়ং কৃষ্ণ কাজটি করেছিলেন। তখন তিনি দ্বারকার অধিপতি, অপরাজিত যোদ্ধা, বিচক্ষণ শাসক। কৃষ্ণর স্ত্রী রুক্মিণীর সঙ্গে বসে ছিলেন। এমন সময় নারদ এসে একটি পারিজাত ফুল দিয়ে কৃষ্ণকে প্রণাম করলেন। কৃষ্ণ ফুলটি দিলেন রুক্মিণীকে।

তাতেই বাধল গণ্ডগোল। নারদ আছেন অথচ কোন গোলমাল নেই, তাও ক্ষতি হয়! কৃষ্ণের দ্বিতীয় স্ত্রী সত্যভামার কাছে পৌছুল সে যে, কৃষ্ণ রুক্মিণীকে পারিজাত ফুল উপহার দিয়েছেন। অসূয়া জেগে উঠল তার। কৃষ্ণের কাছে দাবি করলেন, তাঁকেও এনে দিতে হবে পারিজাত ফুল। রাজি না হয়ে কৃষ্ণের আর উপায় কি? তিনিও সহজেই রাজি হলেন।

একদিন স্ত্রী সত্যভামাকে নিয়ে গেলেন ইন্দ্রপুরীতে বেড়াতে। নন্দন কাননে ঢুকে কৃষ্ণ পারিজাত গাছটি উপড়ে তুলে নিয়ে তাঁর বাহন গরুড়ের পিঠের উপর রাখলেন, দ্বারকায় নিয়ে পুঁতে দেবেন। ইন্দ্রের প্রহরীরা তো স্তম্ভিত! তারা বাধা দিতে এলেই সত্যভামা খুব তেজ দেখিয়ে বললেন 'তোমাদের ইন্দ্রকে গিয়ে বল, তাঁর স্ত্রীর একা পারিজাত ভোগ করার কোন অধিকার নেই। আমি সত্যভামা, কৃষ্ণের স্ত্রী। আমার অনুরোধে কৃষ্ণ এই পুষ্প মর্ত্যে নিয়ে যাচ্ছেন, ইন্দ্রের যদি ক্ষমতা থাকে তো ছিনিয়ে নিন।'

একথা শুনে ইন্দ্রের স্ত্রী শচীরও হল খুব অপমান। তাঁর প্ররোচণায় ইন্দ্র কৃষ্ণের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য তৈরি হলেন। সব দেবতা ইন্দ্রের পক্ষে, আর কৃষ্ণ একা। কিন্তু কৃষ্ণের মত যোদ্ধা ত্রিভুবনে আর কেউ কখনও ছিল না। সব দেবতার অস্ত্র তাঁর আক্রমণে খণ্ড খণ্ড হয়ে গেল। তখন ইন্দ্র স্বয়ং এলেন এগিয়ে, হাতে তাঁর দধীচির হাড় দিয়ে তৈরি ভয়ংকর বজ্র। আর কৃষ্ণের হাতে তার বিখ্যাত সুদর্শন চক্র।

ভয়ংকর যুদ্ধ শুরু হল। ভয়ে ত্রিলোকের অধিবাসীরা কাঁপছে, না-জানি কি প্রলয় ঘটে! ইন্দ্র কৃষ্ণের দিকে বজ্র নিক্ষেপ করলেন। প্রচণ্ড শব্দে সেই অগ্নিময় বজ্র ছুটে গেল কৃষ্ণকে লক্ষ্য করে। কৃষ্ণ একটি হাত বাড়িয়ে সেই ভীষণ বজ্রকে ধরে ফেললেন অনায়াসে, বজ্র নিক্ষেপ বিফল হল।

ইন্দ্রের পরাজয় দেখে সত্যভামা তাঁকে বিদ্রুপ করতে লাগলেন। ইন্দ্র তাঁকে বললেন, 'দেবী, আমি যাঁর কাছে হেরেছি, তিনি স্বয়ং কৃষ্ণ, বিষ্ণুর অবতার। তাঁর কাছে হেরে আমার লজ্জা নেই।' ইন্দ্রের কথায় কৃষ্ণ খুশি হলেন, তাঁকে বজ্রটি ফিরিয়ে দিয়ে বললেন, 'সত্যভামার অনুরোধেই আমি পারিজাতটি নিতে এসেছিলাম। কিন্তু পারিজাত তো আসলে দেবতরু, নন্দনকাননই তার যোগ্য স্থান। আপনি এ গাছটিও ফিরিয়ে নিন।'

ইন্দ্র বজ্র নিলেন কিন্তু পারিজাত নিলেন না। বললেন, 'আপনি এই পারিজাত দ্বারকায় নিয়ে যান। যখন আপনি পৃথিবী ত্যাগ করবেন, পারিজাতও আপনার সঙ্গে স্বর্গে ফিরে আসবে।' শর্ত মেনে নিয়ে কৃষ্ণ ও সত্যভামা গরুড়ের পিঠে চড়ে মর্ত্যে নিয়ে এলেন পারিজাত।

বিষ্ণুপুরাণে মর্ত্যে পারিজাতের আগমন এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

মান্দারের বৈজ্ঞানিক নাম *Erythria indica* যা আমাদের দেশে প্রচুর পাওয়া যায়। কয়েক দশক ঢাকায় একটি নতুন প্রজাতির দেখা মিলছে। পাতায় তার হলুদ ডোরাকাটা, সুদর্শন। বৈজ্ঞানিক নাম *Erythia varieagata*।

পারিজাত সত্যিই এক অপূর্ব পুষ্প। আমি যখন পালতে মান্দারকে পারিজাত মেনে আমার পাঠকবর্গকে তার সঙ্গে পরিচয় করে দিচ্ছি তখন এক বিভ্রম আমাকে তাড়া করল। শুদ্ধাচারী ওয়াহিদুল হক আমার বিভ্রমের কারণ। 'অথঃ পুষ্পকথা' প্রবন্ধে তিনি আলেকজান্ডার কাস্‌লে পারিজাত সন্দর্শনের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেছেন। সেই সঙ্গে তাঁর বাঙ্গালোর ভ্রমণের অনুপম বিবরণ ও অভিজ্ঞতা। সেখানে তিনি দেখেছেন আধ ডজন পারিজাত, 'থোকায় থোকায় লালে লালে একাকার।'

অনেক বিতর্কশেষে তিনি রঘুনন্দনকেই (ময়মনসিংহ মহারাজার মালি) গুরু মেনেছেন। কিন্তু আমার বুঝে ওঠা হয়নি যে, তিনি মাদারকে পারিজাত বলছেন কি না। সাভারে জাতীয় স্মৃতি সৌধে অত্যুজ্জ্বল লাল রং, যেন একটা অগ্নিকুণ্ড, ব্রাউনিয়া দেখতে পাবেন। তাতে মধু আহরণে ব্যস্ত মৌমাছিরা। তপনকুমার দে-র *বাংলাদেশের প্রয়োজনীয় গাছ-গাছড়া* বইতে স্পষ্ট ছবি আছে ব্রাউনিয়ার, বাংলা নাম লেখা নাম পাহাড়ী গোলাপ *(Brownea coccina)*। ওয়াহিদুল হকের বিতর্কও *Brownea* সম্পর্কিত।

এই ব্রাউনিয়া এক অপরূপ সুন্দর বাসন্তিকা। নাটোরে উত্তরা গণভবনে প্রবেশ করেই দেখা পাবেন কয়েকটি পারিজাতের *(Brownea coccina)*। মাদারের আরও প্রজাতি আছে, সেগুলিও চমৎকার, কাঁটাহীন।

আমিরুল আলম খান শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক

পথের পরিমাপ

কাজী রোজী

নানী আমায় অনেকবারই বলেছিলেন,
দেখে শুনে পথ চলিস খুকি
আমি বুঝিনি।
উঠোন-চৌকাঠ এসব পেরোলেই তো পথ
আর পথে নামলেই তো পথ বলে দেয়
কোন পথে এগিয়ে যেতে হয়।

নানী ঠিকই বলতেন,
পথে থাকে গর্ত, অজানা খানা-খন্দ,
চোরাই উপদ্রব।
আমি সেটা বিশ্বাস করেছিলাম।
সৎ পথের নকশা এঁকে
উঠোন বাড়ি ভরিয়েছিলাম।
যত দূর পথ যায় দুচোখ বেয়ে
পথের আর্শিতে পবিত্র আয়োজন রেখেছিলাম
সে পথ ছিল আমার এবং আমার।
আমার সে নানী আজ বেঁচে নেই।
আজকের নানীরা সব বেশ শিখে নিয়েছে
পথের বিভাজন পথের অন্তরায় পথের পরিমাপ।

পথ এন্তার– তবু তার পরিমাপ চাই।
বিস্তৃত বিশ্লেষণ চাই।
হাজার লক্ষ পথে কিষাণীর বীজ বোনা,
হাজার নদীর গানে বাংলার পতাকা সবুজ,
সেটাই তো পথের পরিমাপ।
নানী তুমি তো পথের এই পরিমাপ চেয়েছিলে।

কান্না খুঁজতে এসে

রোকসানা আফরীন

বহুদিন পর বহু দূর থেকে কান্না খুঁজতে এসে
দেখা হয়ে যাচ্ছে আবার
ঘুমন্ত নীল অন্ধকার দেওয়ালগুলো ভাঙছে
সেই সঙ্গে ভেঙে যচ্ছে অরণ্য-জলপ্রপাত
ঘন বনের ওপার থেকে জেগে উঠছে
অন্ধ ময়ূর
আমার দু'চোখ থেকে
মুছে যাচ্ছে পৃথিবী তোমার
আর আমি চোখ বুজে অপেক্ষা করেই চলেছি, অপেক্ষা–
তুমি যে গেছ বকুল বিছানো পথে
কিন্তু আমি দ্বিধায় আছি
কোন দিকে যাব, বুঝতে পারছি না...

ইচ্ছেনদীর স্রোতে

কনকরঞ্জন দাস

আচ্ছা তুমি তোমার সব ইচ্ছেদের চেন?
ওরা কাছে আসে
তুমি চাইলে কী ওরা ধরা দেয়–
নাকি উড়ে যায় অজানা কোন প্রান্তরে।
আচ্ছা তুমি ডাকলে ওরা কথা শোনে?
নাকি ময়ূরপঙ্খী ঘোড়ায় চড়ে
রাজকন্যার দেশে উধাও–
ঠিক করে বল তো–
কষ্টের কথাগুলো শুনতে সে ভালবাসে
নাকি উদাসী সুরে বাঁশি বাজায়–
জানি বলবে না– বিপন্ন হবার ভয়।
আমিও তো বিপন্ন–
তবে আর ভয় কিসের–
ঝরা পাতা কুড়িয়ে চল
ইচ্ছেনদীর স্রোতে ভেসে যাই।

শেকল

অরুণ সেন

স্বহস্তে বানানো, এই যে কারাগার
মাথায় ভয় ঘোরে, তাকেও হারাবার
অবাক জিজ্ঞাসা, খুঁজতে গিয়ে দেয় ডুব
সরল ভালবাসা, জটিল বন্ধন
মিছে কি জেগে আছে, মায়ার ক্রন্দন
বিদেহী দড়ি দেখি পুরাতন চিত্রে চুপ

থাকাতে সুখ বেশে দুঃখের লতাপাতা
জ্বালায় ধিকিধিকি বোবা জীবনখাতা
থেকেও নেই চোখে মূর্খতার অবহেলা
অনেকে বলে তাকে মধুর সংসার
স্পষ্ট দেখে কেউ স্বস্তি সংহার
সুখের অশান্তি ভাসাল তো রসের ভেলা

কালের পরমায়ু মেপে তো দেয় আয়ু
স্বভাবে বলে যায়, তালেই প্রাণবায়ু
তবুও পরিজনে নিশ্বাসে বিষাদ থাকে
সত্যের অভাবে, হায় অন্ধকার
আলোশূন্যতায়, অমৃতের হার
ওইতো ধীসূত্র, অখিল আঘাতের পাঁকে

পালাতে গিয়ে খাল, নামতে হবে জলে
মায়ার পরমায়ু আটক রাখে ছলে
কষ্ট হতে জেগে উঠবে মহাশক্তি
চটি চাটার কথা বেশ শোভন বলা
চাটতে ভালো লাগা ভাঁড়ামি নাকি কলা!
সুখের সোনাবাটি ভরা সত্যে অনুরক্তি

কবিতাটি পাঠিয়ে মুদ্রিত দেখে যাবার আগেই অনন্তের পথে পা বাড়িয়েছেন কবি। আমরা তাঁর বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করি। –সম্পাদক

আমাদের কথা আর তাদের কথা

শেলী সেনগুপ্তা

শর্মীর কথা বলতে বলতে ক্লান্ত তোমাকে
অলকের কথা শোনাই

মধ্যরাত পর্যন্ত শর্মী আর অলক থাকে আমাদের সাথে,
তারপর আমরা হয়ে যাই তারা...

আকাশের উঠোনে হেঁটে হেঁটে
অনাবিল নক্ষত্র কুড়াই
কোচড় ভরে তুলি নীলাম্বরী মেঘে,
সূর্যের দুয়ারে ঘা দিয়ে
ফিরে যাই আপন কুলায়
হাত রেখে শর্মী আর অলকের হাতে...

এভাবে প্রতিদিন
তোমার আমার সাথে শর্মী ও অলক আসে এবং ফিরে যায়।

ভেবেছি বলব না কথা

কাজী নাসিম আহমেদ

তোমার মনের গহীনে কোনদিন পারিনি পৌঁছতে–

নিজেকে উজাড় করে দিয়েছি
– তবু তুমি আছ আজও অধরা

স্বপ্নকে সাথি করে বেয়েছি নৌকা উজানে
গল্প বুনেছি অনেক মনে মনে

এসেছে সময় আজ কথা বলবার,
তবু কেন সরে না ভাষা

হৃদয়ের গভীরে আছে যে, সে থাক
ভেবেছি বলব না কথা।

পাখিদের রৌদ্রস্নান

রনি অধিকারী

দুঃখ বিলাসে দীঘল হিমবাহ জল
হাজার স্তব্ধতা যেন কাল নিরবধি
জলজ পাখির গান কপোতাক্ষ নদী,
রূপালি মাছের ঝাঁক জীবনশৈবাল।

আজীবন বয়ে যায় রোদ পুড়ে গলে
ঘাস ঘুম অন্ধকার এভাবে জীবন
হোক যত কষ্ট পৃথিবীর অনটন,
পাখিদের রৌদ্রস্নান কপোতাক্ষ জলে।

বিষণ্ন হৃদয়ে শুধু সবুজ প্রণাম
অবাধে বন্দনা কর প্রকৃতির নাম।

এই বৈশাখেই নগরবাসী

সাথী দাশ

চৈত্র শেষের ছুঁই ছুঁই দিনের সকাল এক, উজ্জ্বল আলো
যেন লুটোপুটি খাচ্ছে নারিকেল, কাঁঠালের পাতায় পাতায়;
উঁচু উঁচু দালানের ব্যালকনি জানালায়। কানামাছি খেলে
নিত্য আসা চড়ুইগুলো ঘরের ভেতর। আচমকা মেঘে
প্রচণ্ড গর্জন ধ্বনি, ভূমিবাসী কেঁপে ওঠে। জানলায় চোখ রাখি,
আকাশে কালো মেঘের দ্রুত হুড়োহুড়ি। নীল সাদা মেঘ
অন্ধকার ম্লান মুখে লুকিয়ে যাচ্ছে অন্তরালে। বুঝলাম,
ঝড়-বৃষ্টির আগমনী ক্রিয়া। চতুর্দিকে পাখিদের ওড়াওড়ি;
কারোর ভয়ার্ত চিৎকার। দ্রুতলয়ে শুরু কুণ্ডলী বাতাস,
উড়ছে রাস্তার ধুলো, ভাঙছে ডালপালা সাইনবোর্ড। অতঃপর
ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি। ভিজছে মানুষ রাস্তাঘাট গাছ-গাছালি।
মুহুর্মুহু মেঘের গর্জনে মানুষেরা কাপে, কেঁপে ওঠে শহর,
কাঁপছে নীড়হারা পাখি। বৃষ্টিতে ভিজছে অসহায় নগরীর
খাল-নালা-নর্দমা। জলতরঙ্গ-দাপটে মানুষেরা অবরুদ্ধ।

এই বৈশাখেই নাকি নগরবাসীরা নগরাধ্যক্ষ বুঝে নেবে।

আত্মজীবনী পঙ্কজ সাহা

আমাকে কেটে ত্রিভুজ করা হল
তরপর বর্গক্ষেত্র
আমাকে ট্রাপিজে নিয়ে যাওয়া হল
তারপর মধ্যমঞ্চে

আমার পোশাকের উপর
পোশাক চাপানো হল
আমার পোশাক খুলে
নগ্ন করা হল

আমি হাত উঁচু
আমি হাত নিচু
আমি ডানে
আমি বাঁয়ে

আমার মাথায় কেউ
হাত রাখল
কেউ পায়ে হাত
আমার হাতে কেউ হাত রাখতেই
হাততালি
সেই শব্দে উড়ে গেল
প্রাণভোমরা

প্রতিবেশীরা বলল
লোকটা মনে হয় খারাপ ছিল না

লোকটা ছিল!

পঙ্কজ সাহা ভারতের কবি

শিশুতীর্থ

বিগফুট কি সত্যিই আছে?

নাসরীন মুস্তাফা

(পূর্ব প্রকাশিত-র পর)

কেউ কেউ সত্যিই কি বিগফুট দেখেছেন?

২০০৫ সালে তোলা ইয়েতির বেশ কিছু ফুটেজ নিয়ে ডব্লিউএফএএ টিভি রিপোর্ট করেছিল। ফুটেজগুলো লোমশ দৈত্যের বা বিগফুটের। সাসকোয়াচ জেনোম প্রজেক্ট নামের একটি গবেষণা প্রজেক্টের গবেষকদের ক্যামেরায় ধরা পড়েছিল বিগফুটটি। মেলবা কেচাম ছিলেন এই দলের প্রধান। তিনি জানিয়েছিলেন, আমেরিকার টেক্সাসের পূর্বে এবং লুজিয়ানার সীমান্তে এদের পাওয়া যেতে পারে।

বিগফুটের চাচাত ভাই ইয়েতি, হিম ঠাণ্ডা দেশে যার বাস। এই ভাইটি সত্যিই আছে, এর পক্ষে শক্ত প্রমাণ দিলেন ব্রিটিশ জীনতত্ত্ব গবেষক ব্রায়ান স্কাইস। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মানব-জীনতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর ব্রায়ানের এ বিষয়ে খ্যাতি অনেক। তাঁর শক্ত প্রমাণ নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের 'চ্যানেল ফোর' টিভি চ্যানেল 'বিগফুট ফাইলস' নামে একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রচার করেছে। ইয়েতির খুলি থেকে পাওয়া দু'টি চুলের ডিএনএ বিশ্লেষণ করেছেন ব্রায়ান স্কাইস। এই ফাঁকে বলে রাখি, এখন আমি ডিএনএ সম্বন্ধে একটু-আধটু জানি।

ডিএনএ বড় করে বললে হয় ডাই-অক্সিরাইবো নিউক্লিয়িক এসিড। প্রাণী জগতের সবার ডিএনএ আছে। এটি আসলে প্রাণীর জীবগত বৈশিষ্ট্যের সাংকেতিক ভাষা। আমার ডিএনএ-র ভাষা মোটেও বারান্দার বেলি ফুলটার ডিএনএ-র সঙ্গে মিলবে না। আমার ডিএনএ-তে যে সংকেত দেওয়া আছে, আমার সব বৈশিষ্ট্য ঐ সংকেত মেনেই হয়েছে। বেলি ফুলের ডিএনএ গন্ধ ছড়ানোর সংকেত রেখেছে, তাই ও গন্ধ ছড়াতে পারে। ভাইরাস ছাড়া আর সব প্রাণীর প্রতিটি কোষের নিউক্লিয়াসের মধ্যে ডিএনএ থাকে। চুলের কোষেও। আর তাই ইয়েতির খুলি থেকে পাওয়া চুলের ডিএনএ বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানী বুঝতে চেয়েছেন, এই ডিএনএ-র ভেতর কি ধরনের সংকেত আছে। তাহলে বোঝা যাবে, ঐ সব সংকেত যে বৈশিষ্ট্য তৈরি করে, তা কোন্ প্রাণীর আছে।

প্রফেসর ব্রায়ান দেখলেন, ডিএনএ-র সংকেত এখনকার পৃথিবীতে টিকে থাকা আমাদের চেনাজানা কোন প্রাণীর সঙ্গে মিলছে না। আরো আগেকার কোন প্রাণীর সাথে মিলবে কি না, খুঁজতে শুরু করলেন নাছোড়বান্দা বিজ্ঞানী। শেষমেষ দেখলেন, আদিম যুগের মরুভল্লুকের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিলে যাচ্ছে। কিন্তু চুল দু'টি মোটেও মরু এলাকা থেকে পাওয়া যায়নি। হিমালয়ের দু'টি ভিন্ন এলাকা থেকে পাওয়া। কিন্তু দু'টোই মিলে গেল কি না চল্লিশ হাজার বছর আগেকার মরু ভল্লুকের সঙ্গে! নরওয়েতে পাওয়া মরু ভল্লুকটির চোয়ালের হাড়ের ফসিল থেকে ডিএনএ নিয়ে বৈশিষ্ট্য সন্ধান করা হয়েছিল।

কোথায় হিমালয় আর কোথায় নরওয়ে! আর নরওয়েতে আদিম মরু ভল্লুকদের বসবাস ছিল, এমনটি জেনেও তাজ্জব হলেন প্রফেসর ব্রায়ান। তাঁর ধারণা, আধুনিক ভল্লুকদের পূর্বপুরুষ হয়তো মরু ভল্লুকদের থেকে এসেছে। তাই যদি হয়, ইয়েতি থেকে কি কেউ আসেনি? চুল দুটো তো আর মিথ্যে নয়। এগুলো এমন কোন প্রাণীর হতে পারে, যাদের সঙ্গে ইয়েতির সম্বন্ধ আছে। এদের খুঁজলেই তো ইয়েতিকে খুঁজে পাওয়া যাবে। কান টানলে মাথা তো আসবেই, আসবে না?

প্রফেসর ব্রায়ান স্কাইস আরো বড় একটি পরিকল্পনা দাঁড় করালেন। সারা পৃথিবী থেকে ক্লু খুঁজে বিগফুটের পক্ষে প্রমাণ যোগাড় করবেন। করলেনও তাই। ত্রিশটির বেশি 'স্যাম্পল' পেলেন, যেগুলোর ব্যাখ্যাসহ ফলাফল জানালেন সবাইকে। এই ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে তিন পর্বের 'বিগফুট ফাইলস' নির্মিত হল। অনেকেই বলছেন, উত্তর আমেরিকার বিগফুট স্যাম্পলের সঙ্গে মিলে যাবে কোন না কোন স্যাম্পল, তা সে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তেরই হোক না কেন।

এক দিন আব্বু খবর দিলেন, মস্কোর সংবাদ সংস্থা এএফপি নাকি নিশ্চিত হয়েছে, রাশিয়ার সাইবেরিয়া অঞ্চলে ইয়েতির অস্তিত্ব আছে। খবরটা কয়েক বছরের পুরনো, ২০১১ সালের দিকে দক্ষিণ সাইবেরিয়ার কেমেরভো জেলায় একদল অভিযাত্রী নিজের চোখে ইয়েতিদের ঘরবাড়ি দেখে এসেছিলেন। কেমেরভো জেলার সরকারি কর্তৃপক্ষ রীতিমত ওয়েব সাইটে সংবাদ বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে 'স্টেটমেন্ট' প্রকাশ করেছে। আজাস্কা গুহায় অভিযানকালে দুর্গম পাহাড় শরিয়ায় অভিযাত্রীরা ইয়েতির পায়ের ছাপ, পশম ইত্যাদি দেখতে পেয়েছেন বলে সেই স্টেটমেন্টে বলা হয়েছে। এ থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, আজাস্কা গুহায় 'বরফ মানুষ' বসবাস করে।

কেমেরভোর গভর্নর যুক্তরাষ্ট্র, কানাডাসহ আরো কয়েকটা দেশের গবেষকদের দাওয়াত দিয়েছিলেন বরফ মানুষ বিষয়ে সরকারি 'অভিযান'-এর ফলাফল পরীক্ষার জন্য। সেই সব 'অভিযান'-এ বরফ মানুষের আক্রমণের ঘটনাও নাকি ঘটেছিল। হাতেনাতে এসব প্রমাণের জন্যই আমন্ত্রিত গবেষকদের দলটি কেমেরভো যান। সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, "গবেষকরা 'তার' পায়ের ছাপ, ঘুমানোর বিছানার মত কিছু একটা আর নানা রকমের 'চিহ্ন' খুঁজে পেয়েছেন, যা থেকে বোঝা যায় এটাই ইয়েতির রাজত্ব।' বিশেষ গবেষণাগারে পরীক্ষা করা হবে এসব 'প্রমাণসমূহ'।

আম্মু সব সময়ের মত এবারও বাঁকা হাসি হেসে বললেন, পরীক্ষা করা হবে...তারপর জানা যাবে...কি জানা যাবে? সন্দেহ দূর হয় এমন শক্ত প্রমাণ পাওয়া যাবে না।

সারা পৃথিবীতেই খুব গুরুত্বের সঙ্গে প্রচার করা হয়েছিল এই খবর, আব্বু আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন। আমি বুঝতে পারছিলাম, ইয়েতির পক্ষে প্রমাণ পাওয়া না গেলে আমার মনটা খারাপ হয়, এটা আব্বু হতে দিতে চাইছিলেন না। আম্মুকে জোর দিয়ে বললেন, আমেরিকানরা তো রাশিয়ানদের কথা মেনে নিতে চায় না। অথচ কেমেরভোর ইয়েতির খবরটা আমেরিকান পত্রিকাতেও এসেছিল।

যেমন? আম্মু আরো নির্দিষ্ট করে জানতে চান।

ডেইলি মেইল পত্রিকার খবরটা খুঁজলেই ইন্টারনেটে পাবে। দাঁড়াও, দেখাচ্ছি।

আব্বু গুগলে গিয়ে সহজেই পেয়ে গেলেন ২০১১ সালের ১১ অক্টোবরের *ডেইলি মেইল* পত্রিকার সেই খবরটি। শিরোনামটি ছিল এরকম– 'Is this finally proof the Yeti exists? Abominable Snowman 'close to being caught' after coarse hair is found in remote Russian cave'

শিরোনামের নিচে বড় বড় করে আরো লেখা আছে– 'Villagers say 7ft-tall beast has been stealing livestock' এবং 'More than a dozen eyewitness accounts of seeing Yeti'

সাংবাদিক রিক ডিউসবারি এরকমই লিখেছেন– ইয়েতি যে আছে, তার সত্যিকারের প্রমাণ মিলে গেছে; গ্রামবাসীরা প্রায় ধরে ফেলেছিল ৭ ফুট লম্বা সেই বরফ মানুষটাকে, যে কি না গ্রামে ঢুকেছিল চুরি করতে আর যাকে কি না এক ডজনেরও বেশি মানুষ নিজের চোখে দেখতে পেয়েছে!

গুগল থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে আম্মুর সাফ কথাটা হল এরকম– গুজবের খবর সব দেশের পত্রিকাতেই গুরুত্ব পায়। সত্যিটা হল, কেমেরভোর গভর্নরের দেওয়া সংবাদ বিজ্ঞপ্তি ছাড়া ইয়েতির পক্ষে কোন ফটোগ্রাফ বা ডিএনএ প্রমাণ দিতে পারেননি আন্তর্জাতিক গবেষকদলটি। কয়েকটা ভেঙে যাওয়া গাছের ডাল, অস্পষ্ট পায়ের ছাপ আর ধূসর চুল বা পশমের মত কিছু একটা গুহাতে খুঁজে পেলেই কি হল না কি? আমার তো মনে হয়, কেমেরভোতে যাতে বেশি বেশি পর্যটক যায়, সেজন্য এরকম একটা গুজব ছেড়ে দেওয়া হল। সত্যিকারের বিজ্ঞানের ছিটেফোঁটাও নেই এর মধ্যে।

কিন্তু! কেমেরভো যাওয়া গবেষকদের আঁকা ইয়েতির ছবিটা তাহলে কি? ইয়েতির এই ছবিটা আমি সংগ্রহে রাখব ঠিক করলাম।

আম্মুর বাঁকা হাসি আরো চওড়া হয়। বলেন, পরবর্তীকালে বিশেষ গবেষণাগারে 'প্রমাণসমূহ' পরীক্ষা করে আর কিছু কি জানা গেল?

সত্যিই তো? আর কিছু কি জানা গেল? ২০১১ সালে কেমেরভোর গভর্নর যে সংবাদ বিজ্ঞপ্তি দিলেন, তারপর আর কিছু কি বলতে পেরেছিলেন?

আমি আর বুনু ইন্টারনেটে খুঁজতে শুরু করলাম। আর কোন খবর আছে কি না কেমেরভো-র ইয়েতি বা ইয়েতিগুলোর, জানতে হবে।

২০১৩ সালের ২৮ মার্চ যুক্তরাজ্যের *দ্য হাফিংটন পোস্ট* পত্রিকায় একটি খবর বের হয়েছিল। সারা সি নেলসন ভিডিওসহ রিপোর্ট করেছিলেন এই শিরোনামে– 'Yeti & Baby Footage In Siberia Is Real, Says Abominable Snowman Academic Igor Burtsev.'

খবরটা পরে পড়ি। চল বুনু, আমরা আগে ভিডিওটা দেখি।

তা-ই দেখলাম। আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছিল ভিডিওতে বরফের উপর পায়ের ছাপ নিজের চোখে দেখতে পেয়ে। বারো বছরের ইয়েভগেনি আনিসিমভ বন্ধুদের নিয়ে দক্ষিণ সাইবেরিয়ার কেমেরভো জেলার বরফ হয়ে যাওয়া উর নদীতে বেড়াতে গিয়ে ওর হাতে ধরা মোবাইল ফোনের কামেরা দিয়ে ভিডিওটি ধারণ করেছিল।

এগুলো কার বা কাদের পায়ের ছাপ?

ড. ইগর বার্টসেভের মত রাশিয়ার সেরা ইয়েতি বিশেষজ্ঞের বরাত দিয়ে খবরটি বলছে, এই পায়ের ছাপগুলো হচ্ছে একটি বাচ্চা ইয়েতি আর ওর বাবা বা মা ইয়েতির। ড. ইগর বিশ্বাস করেন, এই ফুটেজগুলো একদম 'সাচ্চা' আর পায়ের ছাপগুলো বাচ্চা কোলে করে নিয়ে যাওয়া বয়স্ক কোন ইয়েতির।

ড. বার্টসেভ হচ্ছেন মস্কোর ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার অফ হমিনোলজি-র পরিচালক। *সাইবেরিয়ান টাইমস*কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে পায়ের ছাপের ধরন সম্বন্ধে তিনি বলেছেন, আমরা পরীক্ষা করে বুঝতে পেরেছি ইয়েতি মাত্র একটা নয়, দুটো ছিল। ড. বার্টসেভকে সমর্থন জানিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার ইয়েতি 'বিশেষজ্ঞরা'।

ইয়েভগেনি আর ওর দুই বন্ধু নাকি প্রাণীটার কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। প্রাণীটা ওদের দিকে তাকাল একটু ক্ষণ। এরপর ছুটে পালাল। ইয়েভগেনি আর ওর বন্ধুরাও ভয় পেয়ে পেছন দিকে ফিরে আসে। ড. বার্টসেভ ইয়েভগেনিকে তাঁর স্বাক্ষরে একটি সার্টিফিকেট দিয়েছেন। ইয়েভগেনি এই সার্টিফিকেটটাকে খুব যত্ন করে তুলে রেখেছে। ও যে ইয়েতি দেখেছিল, তার প্রমাণ এই সার্টিফিকেটটা।

আমার খুব মন খারাপ হল জেনে যে ইয়েভগেনির স্কুল পড়গোমি স্কুলের শিক্ষকরা নাকি সার্টিফিকেটটা দেখেও বিশ্বাস করছেন না, ইয়েভগেনি ইয়েতি দেখেছে। ইরিনা উসতিউঝানিনা নামের এক শিক্ষক সোজা বলেছেন, 'ইয়েতি বলে কিছু নেই।'

ইয়েভগেনি এতে অবাক হচ্ছে না। ও আর ওর বন্ধুরা নাকি প্রথমে কোন কিছুই কাউকে বলতে চায়নি। কেউ ওদের বিশ্বাস করবে না, সবাই হাসাহাসি করবে, এটা ওরা আসলেই ভেবেছিল। কিন্তু ক্যামেরা দিয়ে কার ভিডিও করল, এটা জানতে কৌতূহল হচ্ছিল ওদের নিজেদেরই। আর তাই প্রথমে ইয়েভগেনি ভিডিওটা দেখিয়েছিল ওর দাদা-দাদিকে। ওর দাদা-দাদিই প্রতিবেশীদের জড় করে ফেলেন নাতির কাণ্ড দেখানোর জন্য। প্রতিবেশীদের একজন ভিডিওটা পাঠায় মস্কোর ইন্টারন্যাশনাল হমিনোলজি সেন্টারে।

ড. বার্টসেভ *দ্য ভয়েজ অফ রাশিয়া* রেডিওতে বলেছেন, হোমো সেপিয়েন্স যখন বংশবৃদ্ধি করতে লাগল, ছড়িয়ে পড়ছিল সারা পৃথিবীতে, তখন হোমিনিড পরিবারে এর সবচেয়ে কাছের আত্মীয় হোমো নিয়েনডারথালেনসিস বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছিল। এদের কেউ কেউ হয়তো এখনো টিকে আছে কিছু পাহাড়ি দুর্গম এলাকায়। এদের পোশাক নেই, হাতে কোন হাতিয়ার নেই, আগুনের ব্যবহারও এরা জানে না। চারিদিকে এরা কেবলি হোমো সেপিয়েন্সদের বিস্তার দেখে।

ড. বার্টসেভের এরকম 'ইয়েতি দর্শন' মানেননি রাশিয়ারই অনেক

বিজ্ঞানী। অনেকে আবার একেবারে উড়িয়ে না দিয়ে বলছেন, একটা-দুটো এরকম কিছু থাকলেও থাকতে পারে। কেমেরভোতে পাহাড়ের গুহায় গবেষকরা যে ধূসর চুল বা পশম খুঁজে পেয়েছিলেন, সেগুলোর ডিএনএ রিপোর্ট কি বলেছে, জানলাম। এই প্রাণী নাকি 'অজ্ঞাত স্তন্যপায়ী প্রাণী' এবং এরা নাকি হোমো সেপিয়েন্স নয়, তবে 'মানুষের সবচেয়ে কাছের আত্মীয়', মানুষের ডিএনএ-র সঙ্গে সবচেয়ে বেশি মিল যে বানরের, তার থেকেও বেশি মিল এই প্রাণীটির ডিএনএ-র সঙ্গে।

ডিএনএ পরীক্ষা করেছিলেন যে দলটি, তাঁদের একজন হলেন সেন্ট পিটারসবার্গ-এর স্টেট হাইড্রোমেটেরলজিক্যাল য়্যুনিভার্সিটির প্রফেসর ভালেন্টিন সাপুনভ। তাঁরা চুলের দশটি স্যাম্পল নিয়ে পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। প্রফেসর দাবি করেন, প্রাণীটি যে একটি ইয়েতি, সে বিষয়ে তিনি নিজে শতকরা ৬০ থেকে ৭০ ভাগ নিশ্চিত।

এরকম দাবি তো অনেকেই করেছেন। আরো অনেকেই আবার এসব দাবিকে নানান ভাবে উড়িয়ে দিয়েছেন। তাই বলে তো আর ইয়েতি নিয়ে মাথা ঘামানো বন্ধ হয়নি। আমি কেন চুপ হয়ে যাব? যারা ইয়েতির পক্ষে আছেন, আমিও তাদের পক্ষেই আছি। তারা কি বলছেন, যেখানে যত সূত্র পাই, সব মন দিয়ে সংগ্রহ করি। এভাবেই শুনলাম স্যার ডেভিড এটেনবরোর কথা। সম্ভবত পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত প্রাকৃতিক ইতিহাসবিদ ও প্রাকৃতিক ইতিহাসের প্রচারক স্যার ডেভিড এটেনবরো বিশ্বাস করেন বিগফুট আছে, এর পরও কী এসব কথা উড়িয়ে দেওয়া যায়!

ব্রিটিশ টক শো *দ্য জোনাথন রস শো*-তে স্যার এটেনবরোকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। উপস্থাপক জোনাথন রস স্যার এটেনবরোর কথা শুনে হা হয়ে গেলেন, যখন নিজের কানে শুনলেন তিনি বলছেন, '১৯ হাজার ফুট উপরে আমি যে পায়ের ছাপ দেখেছি, তা আসলে বরফ মানুষের। ১৯ হাজার ফুট উপরে এরকম পায়ের ছাপ হাসিঠাট্টা করার জন্য কেউ রাখবে বলে তো মনে হয় না।' স্পষ্ট বলে দিলেন স্যার এটেনবরো।

কেমেরভো যাওয়া গবেষকদের আঁকা ইয়েতির ছবিটা তাহলে কি?

বিগফুট পরিবার বলতে হিম মানব, বরফ মানুষ, ইয়েতিকে যেমন বোঝায়, সাচকোয়াচকেও বোঝায়। ইয়া লম্বা, লোমশ, মানুষের মত দেখতে নিভৃতবাসী প্রাণীকে সাচকোয়াচ বলা হয়, বিগফুটের সঙ্গে ধারণার কোন পার্থক্য নেই। তবে সাচকোয়াচ নামটি প্রচলিত হয়েছে উত্তর আমেরিকার প্রশান্ত-উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে। শব্দটি এসেছে হালকোমেলেম শব্দের ইংরেজি অপভ্রংশ সাচকোয়েটস থেকে। অর্থাৎ, ব্রিটিশ কলম্বিয়ার আদিবাসীদের ভাষা হালকোমেলেম-এর শব্দ সাচকোয়েটসকে ইংরেজি করতে গিয়ে হয়ে গেছে সাচকোয়াচ।

আরো ক'জন বিখ্যাত বিজ্ঞানীর নাম শুনতে পেলাম, যাঁরা তাঁদের বিজ্ঞান গবেষণার জীবনের প্রায় পুরোটাই কাটিয়ে দিয়েছেন 'বিগফুট বা সাসকোয়াচ বা ইয়েতি রহস্য' উদঘাটনের কাজে। গ্রোভার স্যান্ডার্স ক্রান্টজ এবং জেফ্রি মেলড্রাম খুব বেশি কাজ করেছেন বিগফুট নিয়ে, তার পরে বলা যায় জন বিন্ডারনাগেলের নাম।

ইদাহো স্টেট য়্যুনিভার্সিটির নৃবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর হিসেবে কর্মরত আছেন ১৯৫৮ সালের ২৪ মে-র জাতক জেফ্রি মেলড্রাম। আদিম মানুষের পায়ের গঠন আর হাঁটার কৌশল বিষয়ে গবেষণা করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছেন। গ্রোভার স্যান্ডার্স ক্রান্টজ (৫ নভেম্বর ১৯৩১-১৪ ফেব্রুয়ারি ২০০২) ছিলেন আমেরিকান নৃবিজ্ঞানী। তিনি বিগফুট নিয়ে গবেষণা করেছেন তো বটেই, দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন প্রাণীটি সত্যিই আছে পৃথিবীতে। এই বিশ্বাস আর খুঁজে পাওয়া বৈজ্ঞানিক সত্য নিয়ে ৬০টির বেশি একাডেমিক নিবন্ধ এবং মানুষের বিবর্তন বিষয়ক ১০টি বই লিখে ফেলেছেন। ইউরোপ, চিন এবং জাভাতে ছুটে বেড়িয়েছেন গবেষণার কাজে। আর এই কাজ করতে গিয়ে অন্যান্য বিজ্ঞানীর ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ হজম করতে হয়েছে তাঁকে। তিনি নাকি 'গোজামিল বিজ্ঞান' দাঁড় করাচ্ছেন, এরকমও বলাবলি হচ্ছে। এর ফলে গবেষণার জন্য ঠিকমত ফান্ড পেতে সমস্যা হয়েছে তাঁর, ঠিক সময়ে পদোন্নতি হয়নি।

আহা!

বিজ্ঞানী ক্রান্টজ বিগফুট-ইয়েতি-সাসকোয়াচ নিয়ে কথা বলতে গিয়ে কেনেউইক ম্যান নামে নতুন একটি নামও উপস্থাপন করেছিলেন। একে নিয়েও আছে বিরাট এক গল্প।

১৯৯৬ সালের ২৮ জুলাই ওয়াশিংটনের কলম্বিয়া নদীর পাড়ে কেনেউইক নামের জায়গায় খুঁজে পাওয়া গেল প্রাগৈতিহাসিক এক মানুষের হাড়গোড়। রেডিওকার্বন পরীক্ষা করে জানা গেল, মানুষটি আজ থেকে প্রায় ৯ হাজার বছর আগে পৃথিবীতে হেসেখেলে বেড়াত। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ৯ হাজার বছর পরে আদিবাসী আমেরিকানদের অনেক গোত্রই এই মানুষটাকে নিজেদের লোক বলে দাবি করতে শুরু করল। হৈ চৈ চরমে উঠল। জেমস চ্যাটারস্ এবং ডগলাস অসলে নামের দু'জন খ্যাতিমান নৃবিজ্ঞানী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে সাফ সাফ বলে দিলেন, এই মানুষটার হাড়গোড় 'বলেনি' যে এ আজকের আদিবাসী আমেরিকানদের কেউ। বরং এর সঙ্গে পলিনেশিয়ান অথবা উত্তরপূর্ব এশিয়ার মানুষদের মিল বেশি।

বিশ্বাস করা যায়, এই বিতর্ক নিয়ে টানা নয় বছর আদালতে মামলা চলছিল! আদিবাসী আমেরিকানদের সংগঠন দাঁড়িয়ে গেল, সংগঠনটি মানুষটার হাড়গোড় নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করতেই দেবে না। এতে নাকি আদিম মানুষটাকে অপমান করা হচ্ছিল। আমেরিকান সেনাবাহিনির প্রকৌশল বিভাগও জড়িয়ে পড়ল বিষয়টির সঙ্গে। হাড়গোড় পরীক্ষার অনুমতি চাওয়া হল আদালতের কাছে। ২০০৫ সালে একদল বিজ্ঞানী টানা ষোল দিন মানুষটাকে নিয়ে গবেষণা করতে সক্ষম হলেন। এই গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশিত হয় ২০১৪ সালে, *Kennewick Man: The Scientific Investigation of an Ancient American Skeleton* নামে, সম্পাদনা করেছিলেন ডগলাস অসলে এবং রিচার্ড জান্টজ। আর ২০১৫ সালে ডেনমার্কের কোপেনহেগেন য়্যুনিভার্সিটির বিজ্ঞানীরা ডিএনএ পরীক্ষার মাধ্যমে প্রমাণ করে কি বললেন? আদিবাসী আমেরিকানদেরই

কেউ নাকি এই কেনেউইক ম্যান। উত্তর-পূর্ব ওয়াশিংটনের কলভিলে গোত্রের মানুষদের সঙ্গে খুব বেশি মিল পাওয়া গেল। ফলে আদালত রায় দিলেন, হাড়গোড়গুলো কলভিলে গোত্রের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হোক। এর পরও দাবিদাররা থামেনি। শ্বেতাঙ্গ মানুষদের কয়েকটি সংগঠন জোর গলায় বলেই যাচ্ছে, আদিবাসী আমেরিকানদের মত অশ্বেতাঙ্গ নয়, বরং কেনেউইক ম্যান শ্বেতাঙ্গ ইউরোপিয়ানদেরই পূর্বপুরুষদের কেউ একজন।

বিজ্ঞানী ক্রান্টজ কেনেউইক ম্যানকে বিগফুট বলেই বিশ্বাস করেন। ১৯৯৬ সালে তিনি আদালতসহ নানান জায়গায় ছুটে বেড়িয়েছেন, দৃঢ়ভাবে বোঝাতে চেয়েছেন যে বিলুপ্ত মানুষের মত প্রাণীর সঙ্গে আজকের মানুষের সরাসরি সম্পর্ক বা তথ্যসূত্র এখনো আমাদের হাতে আসেনি। তারপরও সত্যটা এই, আদিবাসী আমেরিকান বা শ্বেতাঙ্গ ইউরোপিয়ান বা পলিনেশিয়ান বা এশিয়ার কোন মানুষের সঙ্গে এর সম্পর্ক নেই। প্রাচীন চিনে খুঁজে পাওয়া বিশালদেহী বিগফুটের সঙ্গে কেনেউইক মানুষের সম্পর্ক উপস্থাপন করে তিনি লিখতে শুরু করলেন। মৃত্যুর আগে লেখা সেটাই ছিল তাঁর শেষ বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রবন্ধ, নাম দিয়েছিলেন লেখাটির– "Neanderthal Continuity in View of Some Overlooked Data"। কোথাও প্রকাশের জন্য বিবেচিত হয়নি, তিনি দেখে যেতে পারেননি তাঁর লেখার প্রকাশনা। কেন-না, বিষয়টি যে এমন হতে পারে, তা বিশ্বাস করাই কঠিন হয়ে গেছে 'বুদ্ধিমান'দের কাছে!

অথচ জেমস চ্যাটার নামের সেই বিখ্যাত নৃবিজ্ঞানী, যিনি বলেছিলেন আদিম মানুষটি পলিনেশিয়ান কিংবা এশিয়ার হতে পারে, তিনি আরো কয়েক বছর মাথার খুলির ত্রিমাত্রিক পরীক্ষা করে যা বললেন, তা রীতিমত বিস্ফোরক। তিনি বললেন, হলিউডের বিখ্যাত চলচ্চিত্র *স্টার ট্রেক*-এর অন্যতম প্রধান অভিনেতা স্যার প্যাট্রিক স্টুয়ার্ট কেনেউইক ম্যানের বংশধর!

এর মানে কি দাঁড়ায়? আধুনিক বিগফুট, বা বিগফুটের বংশধর হলিউডের চলচ্চিত্রে অভিনয় করছেন!

সাব্বাশ!

জন এ বিভারনাগেলকে নিয়েও কিছু বলি। সেই ১৯৬৩ সাল থেকে এই বণ্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞ জোর গলায় বলে চলেছেন, তিনি বিগফুটের প্রমাণ পেয়েছেন। ১৯৯৮ সালে বইও লিখে ফেলেন এ নিয়ে, নাম– *North America's Great Ape: the Sasquatch*। কেবলমাত্র বিগফুট খুঁজে পেতে সুবিধা হবে আন্দাজ করে ব্রিটিশ কলম্বিয়ায় নিবাস গাড়েন ১৯৭৫ সালে। ১৯৯২ সালে কমোক্সহ্রদের পাড় থেকে তীব্র হুংকার নিজের কানে শুনেছিলেন, যা মোটেও কোন শিম্পাঞ্জির নয় বলে তিনি সাক্ষ্য দেন। সত্যিকারের বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীরা কেন যে বিগফুট গবেষণায় মনোযোগ দিচ্ছেন না, এ আক্ষেপ তাঁর খুব হয়।

আব্বুর সঙ্গে জন এ বিভারনাগেলের বিষয়ে কথা হচ্ছিল আমার আর বুনুর। কলম্বিয়ায় নাকি আব্বুর স্কুলজীবনের বন্ধু জামান আংকেল

বামে বিখ্যাত অভিনেতা স্যার প্যাট্রিক স্টুয়ার্ট
ডানে কানাডার বন্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞ জন এ বিভারনাগেল

বরফের উপর পায়ের ছাপ পড়ে ছিল। ছাপের ভেতর প্লাস্টার অফ প্যারিস ঢেলে জন এ বিভারনাগেল সেই ছাপ অনুযায়ী পায়ের ছাপ বানিয়েছেন

থাকেন– বহু বছর ধরেই আছেন। আব্বু ফেসবুকে জামান আংকেলকে নক্ করে আমাদের মিষ্টি হাসি উপহার দিলেন। ইন্টারনেটের কারণে পুরো পৃথিবীটাই হয়ে গেছে ছোট্ট গ্রাম। যোগাযোগ করা এখন পানির মত সহজ।

সেই কবেকার স্কুলের নানান কথা, অমুক বন্ধু তমুক বন্ধুর আলাপ-সালাপ সেরে আব্বু জামান আংকেলকে খুলে বললেন বিগফুট নিয়ে মাথা খারাপ হওয়া তার ছোট্ট মেয়েটির কথা। মেয়েটি যে আমি, তাতে তো কোন সন্দেহ নেই। জামান আংকেল খুব বিগলিত হয়ে সরাসরি আমার সঙ্গেই কথা বলতে চাইলেন। আমি কি কি বললাম, মনে নেই, তবে জামান আংকেলের যেন কী হল! উনি সত্যি সত্যিই জন এ বিভারনাগেলের ই-মেইল ঠিকানা খুঁজে দিলেন।

জন এ বিভারনাগেলকে ই-মেইল করা হল। আব্বু আমার নাম দিয়েই তাঁকে পাঠিয়ে দিলেন ই-মেইলটা। তেমন কোন প্রশ্ন-ট্রশ্ন নয়, আসলে বিগফুট নিয়ে তিনি কি বলবেন, তা-ই শুনতে চাইছিলাম আমি।

ই-মেইল পাঠানোর পর থেকেই আমার আর খেতে ভাল লাগত না, ঘুমোতে ভাল লাগত না। ক্লাসের বই তো দূরের কথা, প্রিয় গল্পের বই পড়তেও ভাল লাগত না। একটু পর পরই আব্বুকে ফোন দেই, তোমার ই-মেইলটা চেক কর না। উনি যদি কোন জবাব পাঠিয়ে থাকেন!

দুই দিনের মাথায় রাতের বেলায় জবাব যখন এল, তখন আমার যে কী হচ্ছিল! সমস্ত শরীর থর্ থর্ কাঁপছে। যেন আমি সত্যিকারের বিগফুটের সামনেই দাঁড়াতে পেরেছি!

আম্মু আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে রাখলেন। আস্তে আস্তে আমার শরীরের কাঁপুনি তিনি তার বুকের মাঝে নিয়ে নিলেন। ওদিকে আব্বু পড়ে শোনালেন, জন এ বিভারনাগেল কি লিখেছেন। তিনি আমাকে অনেক আদর দিয়েছেন। আমার মত ছোট্ট এক পুঁচকে শিশু বিগফুটের মত ইয়া বড় প্রাণী নিয়ে আগ্রহ দেখাচ্ছে দেখে তিনি নাকি আমাকে ভালবেসে ফেলেছেন।

তারপর? তিনি আর কি বললেন? বুনু জানতে চাইল। ও নিজেও কম উত্তেজিত নয়।

আমি বললাম, উনি বিগফুট নিয়ে কি বললেন, আব্বু?

আব্বু প্রথমে দেখালেন দুটো পায়ের ছবি। জন এ বিভারনাগেল বেশ কিছু ছবি পাঠিয়েছেন। প্রথম ছবিতে দুটো পা। একটি হচ্ছে বিগফুটের, আকারে বেশি বড়। পাশেরটা মানুষের পা।

দেখেই বুঝতে পারছি বিগফুট আর মানুষের পায়ের আকারের তারতম্যটা কেমন। তবে এই পা উনি পেলেন কোথায়?

বরফের উপর পায়ের ছাপ পড়ে ছিল। ছাপের ভেতর প্লাস্টার অফ প্যারিস ঢেলে তিনি সেই ছাপ অনুযায়ী পায়ের ছাপ বানিয়েছেন। নিজের পায়েরও ছাপ বরফের উপর ফেলে একই কায়দায় নিজের পায়েরও ছাপ বানিয়েছেন।

প্লাস্টার অফ প্যারিস কি, তা তো আগে জেনে নেবে! আম্মু এটুকু বলে আমাদের জানালেন, সাদা গুঁড়োর প্লাস্টার অফ প্যারিসের সঙ্গে পানি মিশিয়ে একটু রাখলেই জমাট সাদা কাদা তৈরি হয়। দাঁতের চিকিৎসায় এই বস্তুটি খুব কাজে লাগে। এক সময় ভাস্কর্য যারা বানান, তারাও একে কাজে লাগাতে শুরু করল। জমাট বানিয়ে ইচ্ছেমত আকারে কেটে-কুটে ভাস্কর্য বানানো যায়।

বুনু পণ্ডিতের মত করে বলল, বিগফুটের পায়ের ভাস্কর্যও করা যায়!

ঠিক তাই।

এবার শোন, বিজ্ঞানী বিন্ডারনাগেল আর কি লিখেছেন। তিনি সাফ কথায় বলেছেন, যেহেতু তিনি নিজে প্রমাণ পেয়েছেন বিগফুটের, কাজেই ওটি আছে। কেন লোকে তাঁকে অবিশ্বাস করবে? কেনই বা তিনি অহেতুক বলবেন যে বিগফুট আছে?

আম্মুর চোখটা সরু হয়ে যেতে দেখলাম। জন এ বিন্ডারনাগেলের মত বড় মানুষ এ্যাত্তো জোর দিয়ে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছেন দেখে আম্মু মনে হয় চিন্তায় পড়ে গেলেন।

বণ্যপ্রাণী বিশেষজ্ঞ হিসেবে তিনি বুঝতে পারছিলেন শুরুতেই, যদি-বা এরকম বড় আকারের প্রাণী থেকে থাকে, তার নিশ্চয় অনেক খাবারের প্রয়োজন হয়। গহীন জঙ্গলে বা পাহাড়ে ওর খাবারের চাহিদা কি মেটে? যদি না মেটে, তাহলে তো ওকে বেরিয়ে আসতেই হবে। অনেকগুলো প্রশ্ন এসে ছিল মনে– সাসকোয়াচ খায়টা কি? এর স্বভাব-ই বা কেমন? শীতের সময় ও টিকে থাকে কিভাবে?

তারপর?

আশেপাশের অনেকের কাছ থেকেই শুনেছিলেন, তারা দেখেছে পাহাড় থেকে ইয়া বড় দৈত্যের মত মানুষ বেরিয়ে আসছে। সেই দৈত্যটা দেখতে কেমন, তা অনেকে তাকে এঁকেও দেখিয়েছে। শোনা কথায় বিশ্বাস করে বিজ্ঞানী তো বসে থাকেন না। তিনিও তাই প্রমাণের সন্ধানে দিনের পর দিন চোখ রেখেছেন চারপাশে। মাটিতে পায়ের ছাপ দেখেছেন। ছুটে চলা সাসকোয়াচের ধাক্কায় গাছের ডাল ভেঙে পড়েছে, কোন কোন গাছ উপড়ে পড়েছে, এমনও দেখেছেন। গাছের মোটা ডাল বাঁকা করে গিট্টি দেওয়া হয়েছে, এমনও খুঁজে পেয়েছেন। এরকম গিট্টি কোন সাধারণ মানুষের পক্ষে দেওয়া সম্ভব নয়। তিনি বিশ্বাস করেন, এই গিট্টি দেখে বোঝা যায়, প্রাণীটি আদিম মানুষের মত অস্ত্রের ব্যবহার শিখতে শুরু করেছে।

ডালের গিট্টি

ব্রিটিশ কলম্বিয়ায় বসবাস শুরু করার পর তিনি আর তাঁর স্ত্রী সাসকোয়াচের অনেকগুলো পায়ের ছাপ নিজের চোখে দেখেছেন। ভ্যানকুভার আইল্যান্ডে জনের বাড়ি, সেখান থেকে সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে থাকা পাহাড়ের বরফের উপর ছিল পায়ের ছাপগুলো। নিজের হাতে পায়ের ছাপের ভাস্কর্য বানিয়েছেন। বন্যপ্রাণীর পেছনে এরকম তাঁকে লেগে থাকতে হয়, বুনো প্রাণীর পায়ের ছাপের পিছু নিয়ে নিয়ে তাদের সম্বন্ধে জানতে চেষ্টা করেন, সাসকোয়াচের বেলায়ও একই কাজ করেছেন। ভল্লুক, হরিণ, নেকড়ে আর আর সব স্তন্যপায়ী প্রাণীদের পায়ের ছাপ তিনি নাকি তাঁর মাথার চুলের মতই চেনেন। সাসকোয়াচের পায়ের ছাপ দেখেই বুঝে ফেলেছিলেন, এ ছাপ চেনা কোন প্রাণীর নয়। তিনি খুব খুশি এই সত্যটা জানতে পেরে যে, সাসকোয়াচ কোন কল্পনার প্রাণী নয়। বাস্তব পৃথিবীতেই ওর বাস। নিজেদের বেঁচে থ াকার প্রমাণ তো ওরা দিয়েই যাচ্ছে। মানুষ যদি এত সব দেখেও অবিশ্বাস করে, সত্যিটা জানতে না চায়, তবে সাসকোয়াচরা কি করবে?

আম্মুর বুকের ভেতর আমি কেন যেন দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনলাম। আমি তো তখন আম্মুর বুকের মাঝে কান পেতে ছিলাম!

নেপালের আনুছা হিম মানবের কথা বলে আমাকে অন্য রকম করে দিয়েছিল। হিমালয় পাহাড়ের নির্জন কোণে কোণে ঘুরে বেড়ানো ইয়েতিদের বুকের ভেতরকার কষ্ট আমি তখনি টের পেয়েছিলাম। যত দিন গেছে, যখন জেনেছি বিগফুট নামে বিশাল দৈত্যের মত প্রাণী আছে পৃথিবীর নানা জায়গায়, তখন আমার ওদের সবার জন্যই মন যেন কেমন করত! আর আজ জন এ বিন্ডারনাগেল নামের বুনো প্রাণীর পেছনে খুব ভালবাসা নিয়ে ছুটে বেড়ানো মানুষটা যখন আমার জন্য সাসকোয়াচ নিয়ে অনেক কিছু লিখে পাঠালেন, তখন আমার যে কিরকম লাগছিল, তা আমি আম্মুকে, আব্বুকে, এমনকি বুনুকেও বলতে পারব না। অথচ বুনুকে আমার মনের সব কথা না বলে আমি কিছুতেই শান্তি পাই না।

আম্মু আমাকে আরো জোরে জড়িয়ে ধরলেন। আমি জানতে চাইলাম, সাসকোয়াচের বানানো গাছের মোটা ডালের গিট্টি দেখে কি ভয় পেয়েছ?

আম্মু অবাক হলেন। বললেন, ভয় পাব কেন?

ওরকম গিট্টি বানাতে বানাতে সাসকোয়াচ বা বিগফুট বা ইয়েতিরা কিন্তু অনেক কিছু বানাতেই শিখে যাবে। এক সময় মানুষও তো এরকম কি কি বানাত, আর এখন রকেটও বানায়।

আব্বুও সায় দেন আমার কথায়। যত দিন যাবে, সাসকোয়াচ বা বিগফুট বা ইয়েতিরা সত্যি সত্যিই হয়তো অনেক কিছু বানাতে শিখে যাবে। এমনিতেই ওরা মানুষের চেয়ে বেশি বড়, বেশি শক্তিশালী। তার উপর যদি হাতে অনেক কিছু থাকে, তখন মানুষদের কি হবে?

আমি আম্মুর কাছে জানতে চাই, মানুষের তখন কি হবে ভেবেই কি তোমার মন খারাপ?

আম্মু ভেজা ভেজা গলায় বললেন, মানুষের জন্য মন খারাপ না। মানুষ কেন মানুষের মত কাজ করে না, তার জন্য মন খারাপ। পৃথিবীতে যত প্রাণী আছে, সবার বারোটা বাজিয়ে দিচ্ছি আমরা মানুষেরা। ছোট প্রাণীদের কি ভালবাসি? বড় দৈত্যাকার বিগফুটদের সামনে দেখলে, সত্যিই ওরা আছে নিশ্চিতভাবে টের পেয়ে গেলে মানুষ কি যে করবে! মানুষ ওদের মেরে ফেলবে।

বুনু প্রতিবাদ করে ওঠে, ওরকম হলে মানুষকে আর ভালবাসি আমি? বাসবই না। কিছুতেই না।

আমি জোর দিয়ে বলি, মানুষ যদি তখন বিগফুটকে মারতে চায়, বিগফুটও মারবে। আমি বড় হয়ে বিগফুট খুঁজে বের করব আর ওদের শিখিয়ে দেব, কিভাবে মানুষকে মারবে।

আম্মু তখন আমাকে আর বুনুকে একসঙ্গে জড়িয়ে ধরেন। আমাদের কপালে চুমু খেয়ে বলেন, না না। কাউকে মারামারি শেখানো ভাল কাজ নয়।

তাহলে?

যদি কখনো বিগফুট বা সাসকোয়াচ বা ইয়েতির সঙ্গে দেখা হয়, তখন এই রকম করে ওকে জড়িয়ে ধরবে। ওকে ভালবাসবে। বলবে, তোমার সঙ্গে এক সঙ্গে এই পৃথিবীতে আছি। আমি তোমার বন্ধু।

আম্মু আমাকে আর বুনুকে আরো শক্ত করে জড়িয়ে ধরলেন। আর আব্বু জড়িয়ে ধরলেন আমাদের সবাইকে। তারপর বললেন, আর সব মানুষকে বলবে, পৃথিবীতে যত প্রাণ আছে, সবাইকে আমরা ভালবাসব। কাউকে মারব না। গাছ হলেও না। পিঁপড়ে হলেও না। বিগফুট বা সাসকোয়াচ বা ইয়েতি হলেও না।

কম্পিউটারের মনিটরে তখন জন এ বিন্ডারনাগেলের হাসিমুখের ছবিটা আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকল। কেন যেন আমার কানে ভেসে আসছিল অচেনা অজানা কার আওয়াজ। কি বলছিল, বুঝতে না পারলেও কেন যেন মনে হচ্ছিল, কেউ আমাকে বলছে– এস বন্ধু। ভালবাসা দিতে এস। ভালবাসা নিতে এস।

কে সে?

বন্ধু!

● সমাপ্ত

নাসরীন মুস্তাফা
কথাসাহিত্যিক ও বিজ্ঞানলেখক

সৌহার্দ

ভারতে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি

ভারত সরকার প্রত্যেক বছরে ভারতীয় কারিগরি ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা (ইন্ডিয়া টেকনিক্যাল এন্ড ইকোনমিক কো-অপারেশন-আইটিইসি) কর্মসূচির আওতায় প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রস্তাব দিচ্ছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের ৫০টি স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠানে এসব স্বল্পমেয়াদী কোর্সের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের বিষয় যেমন– একাউন্টিং, টেলিযোগাযোগ, ইংরেজি, ব্যবস্থাপনা, গ্রামোন্নয়ন ও অন্যান্য বিশেষায়িত কারিগরি কোর্স। ভারত সরকার ৩-৬ মাসের সংক্ষিপ্ত ও মাঝারি মেয়াদি এসব কোর্সের ব্যয়ভার বহন করে।

যোগ্যতা

আবেদনকারীর বয়স ২৫-৪৫ বছরের মধ্যে হবে এবং সরকারি-বেসরকারি বিশেষায়িত কোর্সের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে। সরকারি প্রতিষ্ঠান, বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, স্বনামধন্য কর্পোরেট হাউস বা বাণিজ্যিক সংস্থায় কর্মরত ব্যক্তিবর্গ এ কোর্সে প্রশিক্ষণ নিতে পারবেন। ইংরেজির ব্যবহারিক জ্ঞান অত্যাবশ্যক।

কিভাবে আবেদন করবেন

আইটিইসি-র যে-কোন কোর্সে আবেদন করতে হলে আবেদনকারীকে আইটিইসি-র https://itecgoi.in পোর্টালে গিয়ে নিজস্ব লগইন ও পাসওয়ার্ড তৈরি করে নিজেদের নাম রেজিস্টার করতে হবে। তারপর অনলাইনে মনোনীত কোর্সে আবেদন করতে হবে। আবেদনপত্র জমা দেওয়ার পর আবেদনকারী ফরম ডাউনলোড করে আবেদনপত্রটি হাইকমিশন অফ ইন্ডিয়া, ঢাকা-য় ফরওয়ার্ড করবেন।

সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিকে অর্থমন্ত্রণালয়ের অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ বা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুপারিশসহ আবেদনপত্র পাঠাতে হবে। কোর্সের বিস্তারিত বিবরণ এবং আবেদনপত্র নিম্নলিখিত লিঙ্ক থেকে পাওয়া যাবে:- http://itec.mea.gov.in লিঙ্কগুলো ভারতীয় হাই কমিশনের ওয়েবসাইট www.hcidhaka.gov.in-এর Education & Training সেকশনেও পাওয়া যাচ্ছে। যে কোন তথ্যের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন: fshoc@hcidhaka.gov.in এবং commerce@hcidhaka.gov.in

Training Programme in India

The Government of India offers the training courses under the India Technical and Economic Cooperation (ITEC) programme every year. The courses include diverse subjects such as Accounting, Telecommunication, English, Management, Rural Development and other specialized technical courses in over 50 reputed Institutions across India. These are short and medium term courses of between 3-6 months duration and are completely sponsored by the Government of India.

Eligibility

The applicants must be between 25-45 years of age and should have 5 yearsÕ relevant work experience in the area of specialized course in either Government or in a private organisation. They may belong to Government, Universities, reputed corporate houses or trade bodies. Working knowledge of English is essential.

How to apply

To apply for any ITEC course, the applicant must visit ITEC portal at https://itecgoi.in and register himself/herself by creating their own login and password. Thereafter, apply for the selected course online. After submitting the application form, the selected course online. After submitting the application form, the applicant should download the form and forward the application to the High Commission of India, Dhaka along with a letter of recommendation from the parent organisation of the applicant. Applicants working in the Government must approach the Economic Relations Division (ERD), Ministry of Finance or the Ministry of Foreign Affairs of the Government of Bangladesh for recommending the applications.

The details of courses on offer for the year and application forms can be downloaded at the following links :-

http://itec.mea.gov.in

The links are also available at the website of the High Commission of India at www.hcidhaka.gov.in under the Education & Training section.

Any queries may be addressed to fshoc@hcidhaka.gov.in & commerce@hcidhaka.gov.in

ছোটগল্প

উত্তম পুরুষে প্রেমের গল্প

মশিউল আলম

কৈফিয়ত

বিবাহিত লেখকদের পক্ষে উত্তম পুরুষে প্রেমের গল্প লেখা কঠিন। আমি মশিউল আলম, ধরুন জনৈক আবু রায়হান সেজে একটা গল্প লিখলাম: রোকেয়া সুলতানাকে ভালবাসি... ইত্যাদি, তাহলে কিন্তু বড়ই বিপদ ঘটে যাবে।

সংসারে সুখ-শান্তি বজায় রাখতে চায়, আবার উত্তম পুরুষে প্রেমের গল্পও লেখে এমন লেখক এই বাংলাদেশের লেখকসমাজে আপনারা সম্ভবত একজনও খুঁজে পাবেন না। গল্প-উপন্যাসে একটু-আধটু প্রেম থাকেই; সেগুলো প্রায়ই বানিয়ে তোলা অথবা কিঞ্চিৎ সত্যের সঙ্গে প্রভূত পরিমাণে কল্পনার রঙ চড়িয়ে লেখা। কিন্তু লেখকদের স্ত্রীরা যখন সেগুলো পড়ে তখন তাদের ভেতরে মনে ও মস্তিষ্কে মারাত্মক বিষক্রিয়া হয়। বদরাগী স্ত্রীরা স্বামীর খাতাপত্তর ছিঁড়ে ফেলে, কলম ভাঙে, কম্পিউটার পর্যন্ত ভেঙে ফেলতে চায়। যারা একটু নরম-সরম ও শান্তিপ্রিয় স্বভাবের, তারা মুখ ভার করে থাকে, কান্নাকাটিও করে। প্রিয় পাঠক, আমার এসব কথা বলার কারণ এত সমস্যা স্বত্ত্বেও আমি উত্তম পুরুষে একটা গল্প লেখার ঝুঁকি নিতে যাচ্ছি। গল্পটা আসলে আমার এক বাল্যবন্ধুর, আমি তার আসল নামটা গোপন রাখতে চাই। কারণ, সে বিবাহিত আর এটা তার প্রেমের কাহিনি। বিবাহিত পুরুষদের বিবাহ-পূর্ব সময়ের প্রেমের কাহিনি ফাঁস করা অন্যায়। তাই আমি আমার বন্ধুটার নাম দিলাম আবু রায়হান।

সে এক ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপক। আধুনিক ও বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ, সাহিত্য পড়তে ভালবাসে। আমিই তার একমাত্র বাল্যবন্ধু, যে স্কুল-কলেজের সব পরীক্ষায় আগাগোড়া ভাল ফল করেও ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার না হয়ে লেখক হয়েছে। তাই সে আমাকে বেশ পছন্দ করে।

সব মানুষের জীবনে যেমন দুঃখ থাকে, আবু রায়হানের জীবনেও তেমনি একটা গভীর দুঃখ আছে। আর আমার ধারণা, সব মানুষেরই বুকের মধ্যে এরকম একটা হাহাকার বাজে: ও আমি মনের দুঃখ কাহারে জানাই!

মানুষ দুঃখ উপভোগ করে, কিন্তু একা একা সেই উপভোগে তার সুখ নেই, সে অন্যদের তার দুঃখের ভাগ দিতে চায়। আবু রায়হান আমাকে তার গল্প বলে। শুধু বলেই ক্ষান্ত হয় না, আবদার করে যে সেই গল্প আমাকে লিখতে হবে। সে লেখক হলে নিজেই লিখে ফেলত। কিন্তু যেহেতু লেখক নয়, তাই আমার শরণাপন্ন হয়েছে। গল্পটা সে কী রূপে পেতে চায় তা আমাকে বলে:

গল্পটা আমাকে বলতে হবে উত্তম পুরুষে, মানে আমি আমি করে। সে ব্যাপারটা আমাকে বুঝিয়ে বলে, 'আমার নিজের গল্প আমি অন্যের বয়ানে শুনতে চাই না। গল্পটা পড়তে পড়তে যেন মনে হয় আমি নিজে আমার গল্প বলতেছি। কিন্তু আমার তো সেইভাবে লেখার ক্ষমতা নাই রে দোস্ত!'

আবু রায়হান এমন করুণ আফসোসের সুরে কথাগুলো বলে যেন এই একটি গল্প লেখার জন্যই তার লেখক-প্রতিভা নিয়ে জন্মানো উচিত ছিল।

সুতরাং প্রিয় পাঠক, উত্তম পুরুষে একটা গল্প লেখার ঝুঁকি আমি নিচ্ছি। বাল্যবন্ধু আবু রায়হানকে আমি বড় ভালবাসি।

আবু রায়হানের গল্প

আজ রমজানের দশ তারিখ। প্রতিবছর এই রাতে আমার ঘুম আসে না, সারাটা রাতই নির্ঘুম কেটে যায়। এরকম চলছে পাঁচ বছর ধরে। বাকি জীবনটাও হয়তো এভাবেই কেটে যাবে। হয়তো নয়, এতদিনে আমি নিশ্চিত জেনে গেছি, আমার অবশিষ্ট জীবন এভাবেই একটা টেলিফোন কলের অপেক্ষায় থেকে থেকে কেটে যাবে।

আমি জানি না জীবনের বাকি অংশ আরও কত লম্বা হবে। কারণ এখন আমার বয়স মাত্র ৩৫। নিশ্চয় ৭০-৮০ বছর বাঁচব; আমার বংশের সবাই বেশ দীর্ঘজীবী। মানুষ দীর্ঘজীবন কামনা করে। আমিও তা-ই কামনা করি।

কিন্তু একটা তুচ্ছ ব্যাপারের অপেক্ষায় থাকব বলে দীর্ঘজীবন কামনা? যখন নিশ্চিত জানি যে সেই অপেক্ষা নিষ্ফল?

জীবনের প্রহেলিকা কিছুতেই ঘোঁচে না। এটা অনেক প্রাচীন কথা। আমাদের জীবনে প্রায় সবকিছুই পুরনো। জগৎ-সংসারে নতুন কিছু নেই আসলে। সেই পুরনো সুখ, সেই পুরনো দুঃখ নিয়ে আমরা জীবন যাপন করি। তবু এত পুরনোর মধ্যে এক সীমাহীন বিস্ময় আমাদের বিমূঢ় করে রাখে: জীবন কেন এমন? আমাদের সকলের দৃষ্টি ও চেহারার মধ্যে যে-বিমূঢ়তা আছে তা আসলে এই প্রশ্ন: জীবন এমন কেন?

এই প্রশ্নের মধ্যে কি বিষণ্নতা আছে? এই বিস্ময় কি দুঃখময়? আমি জানি না। আপনারা কেউ কি জানেন? আপনারা যখন আপন মনে প্রশ্ন উচ্চারণ করেন, আমার জীবনটা কেন এমন হল?– তখন কি এই জিজ্ঞাসা উৎসারিত হয় দুঃখ থেকে?

জানি, কারো কারো আফসোস থাকে। তারা মনে করে জগতে তাদের মত দুঃখী আর কেউ নেই। তারা আসলে আপন বুকের গভীরে দুঃখসাধন করে। আমি কিন্তু ওরকম নই। আমার মনে হয় জগতের সব নারী ও পুরুষ আমার মতই দুঃখী।

তাই, অপেক্ষা নিষ্ফল জেনেও, আমি এই জগৎ-সংসার ছেড়ে সাততাড়াতাড়ি চলে যেতে চাই না। নিশ্চিত নিষ্ফল অপেক্ষাময় এ-জীবন আমার কাছে এখনও দুর্বহ হয়ে ওঠেনি।

কিন্তু কিসের অপেক্ষা করছি আমি? আসলেই কি অপেক্ষা করছি? নাকি মেতে ওঠার মত, নিমগ্ন হয়ে থাকার মত একটা অজুহাত লুফে নিয়েছি মাত্র?

এখন আমি জেগে আছি, আমার মনের এক নিভৃত কোণে একটা প্রত্যাশা উন্মুখ হয়ে চুপ করে আছে: টেলিফোনটা হঠাৎ বেজে উঠবে। কিন্তু আমি তো জানি, এই প্রত্যাশা নিষ্ফল। এই রাত চারটায় টেলিফোন বাজবে না। যদি বেজে ওঠেও, সেটা আমার অপেক্ষার অবসান ঘটাবে না। সে হবে অন্য কেউ, আমি যার অপেক্ষা করছি সে নয়। আবার মনের কোণের ছোট্ট পোকাটি বলছে, কেন? হতে পারে না কেন? অসম্ভব কী? সে কি মরে গেছে?

আমি জানি, আমার মত সে-ও বেঁচে আছে। আমি যদি না মরি সে কেন মরবে? আমরা পরস্পরকে হারিয়ে ফেলার পরেও কত বছর ধরে বেঁচে আছি। থাকব না কেন? মানুষ কি এত দুর্বল, এতটাই নাজুক প্রাণি যে প্রিয়জনকে না পেলে প্রাণশক্তিই হারিয়ে ফেলবে? মাটির তলায় সেঁধিয়ে যাবে? একমাত্র সন্তানকে চিরতরে হারিয়েও মা দিব্যি বেঁচেবর্তে থাকে, আর প্রেমিকা চলে গেছে বলে (আমি নিশ্চিত, মরে যায়নি!) প্রেমিক মরে যাবে?

তবে হ্যাঁ, আমার বেঁচে থাকাটা অন্যরকম। সরল নয়, বড় জটিল। অত্যন্ত জটপাকানো একটা ব্যাপার। কারণ, আমি আমার বউকে মনেপ্রাণে ভালবাসি। আবার সারাজীবন ধরে অন্য একজনের নাম আমার বুকের মধ্যে বেজে চলেছে। (তাকে আমি হারিয়ে ফেলেছি!)

দশ বছর আগে যে-মেয়েটি আমাকে বিয়ে করতে রাজি হয়েছিল সে জানত যে আমার একজন প্রেমিকা ছিল। কিন্তু সেটা এই অর্থে একটা মামুলি খবর ছিল যে, বিয়ের আগে সব ছেলেরই অমন দুই-চারজন প্রেমিকা থাকে। বিয়ের পরে ধীরে ধীরে তারা স্মৃতি থেকে উধাও হয়ে যায়। যে-মেয়ে বউ হয়ে আসে সে দেহমনের ওপর এমন একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠা করে বসে যে সেখানে আর সবাই উটকো হয়ে যায়, কারোর কোন জায়গা অবশিষ্ট না।

আমার বেলায়ও তা-ই হয়েছিল। আমিও আমার বউকে ভীষণ ভালবেসেছিলাম। (এখনও খারাপ বাসি না!) তারপর, বছরতিনেক পরে যখন আমাদের কোল জুড়ে একটা ফুটফুটে মেয়ে এল, তখন আমাদের সংসারটা বাস্তবিক একটা চাঁদের হাট হয়ে উঠল। কিন্তু ওই চাঁদের হাটে জ্যোৎস্না ঢেলে দিচ্ছিল যে-চাঁদ, সে ছিল অন্য কোনওখানে। আমার মন পড়ে ছিল আকাশে। আমার আপন স্ত্রী-কন্যার কোলাহলমুখর চাঁদের হাটে সব শব্দের গভীরে অন্য একটা নামের অনুরণন চলছিল অবিরাম।

কিন্তু তার ফলে সংসারযাপনে বাস্তব কোন সমস্যা ঘটেনি। আমার বুকের ভিতরের শব্দ বুকের ভিতরেই ছিল। মুখ ফুটে কখনও বেরিয়ে আসতে দিইনি সেই নাম। স্বপ্নেও সতর্ক থেকেছি (আমি খুব যত্নবান এবং সদাসতর্ক একজন সংসারী পুরুষ!) যেন ভুল করেও মুখ ফসকে বেরিয়ে না আসে ওই নাম।

কৈশোর পেরিয়ে তরুণ হতে না হতেই তাকে যে হারিয়ে ফেলেছি তারপর কতগুলো বছর চলে গেছে, তাকে আর একদিনও কোথাও দেখতে পাইনি। সে কোথায় আছে, কী করছে এসবের কোন খোঁজই আমি আর পাইনি। ফলে, বাস্তব যোগাযোগের কোন সুযোগ বা সম্ভাবনা যেহেতু ছিল না, আমার বউয়ের মনে সন্দেহ জাগারও কোন সুযোগ বা কারণ কখনো ঘটেনি। সে মনে মনে এমন সুখী ও পরিতৃপ্ত এক গৃহিণীর জীবন যাপন করছিল যে তাকে দেখে তার চেনা-পরিচিত মেয়েরা (দাম্পত্যকলহে যাদের জানপ্রাণ ঝালাপালা হয়ে গেছে) রীতিমত ঈর্ষায় জ্বলেপুড়ে যেত।

এটাকে আমি আমার সাফল্য হিসেবে দেখি, ব্যর্থ প্রেমিকের জ্বালা বুকে নিয়ে আমি সফল সংসারী স্বামীর গৌরব অনুভব করি। গভীর রাতে কৈশোরের রাজকন্যাকে স্বপ্নে দেখে আমার বুকের ভিতরে হু হু করে কেঁদে ওঠে (কেবল বুকের ভিতরেই, কারণ পাশেই বউ ঘুমায়!), রাতে বউ ও মেয়ের প্রিয় মুখ দেখতে দেখতে আমি ঘুমিয়ে পড়ি (তারপর কোথায় যাই তার খবর তারা পায় না), সকালে ঘুম ভেঙেও দেখতে পাই তাদের সোনামুখ (ওহ্ আমি সুখী!)।

তারপর একদিন অসময়ে, গভীর রাতে টেলিফোন বাজার শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। চমকে উঠে বসে ইলেকট্রনিক হাতঘড়িটার লাইট জ্বালিয়ে দেখলাম রাত বাজে চারটা। প্রথমেই মনে হল, যে ফোন করেছে সে ঢুকে পড়েছে রং নাম্বারে। স্ত্রী-কন্যার ঘুম ভেঙে যাওয়ার ভয়ে বেশিক্ষণ বাজতে দিলাম না। রিসিভার তুলে নিচু স্বরে প্রায় ফিসফিস করে বললাম, 'হ্যালো!'

ওপাশে কোনও সম্ভাষণ নেই। কোন সৌজন্য ছাড়াই একটি নারীকণ্ঠ

বেজে উঠল, 'তুমি তো রোজা রাখ না... ।'

আমি তার কথা শেষ করতে দিলাম না, মাঝখানে বলে উঠলাম, 'কে বলছেন?'

'চিনতে পারলে না? তাহলে তো নাম বললেও চিনতে পারবে না।'

আমি এবার নির্ভুলভাবে কণ্ঠটি চিনে ফেললাম এবং বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। সে বলে চলল, 'যাক, তাতে আমার দুঃখ নাই। বলছিলাম, তুমি তো রোজা রাখ না। আজ আমি রাখতে বলছি। সেহরি খাও... ।'

সে কথা বলে চলেছে, আমি তাকে এক সঙ্গে এত কথা বলতে দিতাম না, মাঝখানে অবশ্যই তাকে থামাতাম, অনেক কিছু জিজ্ঞাসা করতাম, যদি বিস্ময়ে আমার কথা বলার শক্তি হারিয়ে না যেত!

'...খাওয়ার মত কিছু নাই নিশ্চয়ই? বউও তো একটা জুটিয়েছ নিজের মতই নাস্তিক। যাক, কিছু একটা খেয়ে পেট ভরে পানি খেয়ে নাও। এ বয়সে সেহরির সময় কিছু না খেয়েও দিব্যি রোজা করা যায়। সেহরির নিয়ত নিশ্চয় মনে নাই? দরকার নাই, মনে মনে বল, আল্লা রোজা রাখছি, তুমি কবুল করে নিয়ো।'

আমাকে একটা শব্দও উচ্চারণ করার সুযোগ না দিয়ে সে ফোন রেখে দিল। আমি রিসিভার রাখার সঙ্গে সঙ্গে বউয়ের গলা বেজে উঠল, 'কে?'

আমি চমকে উঠে তক্ষুনি বলে ফেললাম, 'রং নাম্বার।'

আত্মরক্ষার সহজাত বুদ্ধিটা কাজ করল পুরোপুরি স্বয়ংক্রিয়ভাবে। বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে আমি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ। বউ আবার ঘুমের দেশে ফিরে গেল।

আমি বেডরুম থেকে নিঃশব্দে বেরিয়ে বাথরুমে গেলাম। প্রস্রাব করে হাতমুখ ধুলাম। তারপর বেরিয়ে ডাইনিং স্পেসের আলো জ্বাললাম। ফ্রিজ খুলে দেখলাম খাওয়ার মত কিছু নেই। ফ্রিজের মাথায় বিস্কিটের কৌটা দেখতে পেয়ে সেটি নামিয়ে খুললাম। একটা টোস্ট বিস্কিট বের করে চিবুতে চিবুতে ভাবতে লাগলাম, এ কেমন করে সম্ভব? পনেরো বছর ধরে যার সঙ্গে দেখা নেই, পনের বছর আগে যে আমার জীবন থেকে চিরতরে হারিয়ে গেছে, তারপর থেকে যার সঙ্গে আর একটি বারও দেখা হয়নি, টেলিফোনে কথা হয়নি, চিঠিতেও আলাপ হয়নি, যার কোন খোঁজ-খবরই আমি জানি না, সে কী করে আমার টেলিফোন নাম্বার পেল?

এটা কী করে হল? আমি কি স্বপ্ন দেখছি? কিন্তু বউ যে কথা বলে উঠল আমি তো তা স্পষ্ট শুনতে পেলাম। জবাবটাও দিলাম বেশ বুদ্ধি করেই।

না, স্বপ্ন নয়। সত্য, এটা নির্ভুল সত্য।

আমি তার কণ্ঠ শুনতে পেলাম। সে আমাকে রোজা রাখতে বলল। আমাদের বয়স হয়ে যাচ্ছে। এখন ধর্মকর্মে মন দেওয়া দরকার। আমি কি জীবনে অনেক পাপ করেছি? আমি দোজখে যাই ছবি সেটা চায় না?

ছবি! সেই নাম! বুকের ভিতরে অবিরাম অনুরণন। কিন্তু এতগুলো বছর পর ছবি আমার ফোন নাম্বার পেল কোথায়? সে নিজেই-বা কোথায় এখন? কী করছে? তার স্বামীটা কেমন? ক'টা ছেলেমেয়ের মা হয়েছে সে? সে কি এতদিন স্বামীর সঙ্গে বিদেশে ছিল? সদ্য এ-শহরে এসে আমার পরিচিত কাউকে খুঁজে পেয়েছে? আমার সেই পরিচিত জনই কি তাকে আমার টেলিফোন নাম্বার দিয়েছে?

কিন্তু কেন সে রাত চারটায় ফোন করবে আমাকে? রাত চারটা কি কাউকে ফোন করার সময়? নাহ্ আমি স্বপ্ন দেখছি। নিশ্চয়ই এটা স্বপ্ন। কিন্তু স্বপ্ন কি এমন জাজ্বল্যমান বাস্তব হতে পারে? আমি তো বাস্তবেই বিস্কিট চিবাচ্ছি। বউ যে 'কে' বলে উঠল, সেটাও তো বাস্তব। নাকি বউ কিছু বলেনি? আমি ভুল শুনেছি?

আমি নিজের গায়ে চিমটি কাটি, যথারীতি ব্যথা লাগে। কিন্তু এতেই প্রমাণ হয় না যে এটা স্বপ্ন নয়। কারণ স্বপ্নের মধ্যেও আঘাতে ব্যথা লাগে। তাহলে কি বউকে ডেকে তুলব? না, সে বিপত্তি ঘটাবে। কৈশোরের প্রেমিকা, যে-কিনা আমার জীবন থেকে ১৫ বছর আগেই হারিয়ে গেছে, তার ভূত আমাকে ধাওয়া করেছে– এটা কি বউকে জানানোর বিষয়? আমি কি এতই বেকুব?

দুটো টোস্ট বিস্কিট আর দুই গ্লাস পানি খেয়ে ব্যালকনিতে গিয়ে একটি সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে আমার মাথাটা গরম হয়ে উঠল। মনে হল, কোন জটিল মানসিক অসুখ দেখা দিচ্ছে। একমাত্র পাগল ছাড়া আর কারোর চৈতন্যে এমন ধারার বিভ্রম ঘটতে পারে না।

সিগারেট শেষ করে আবার এক গ্লাস পানি খেয়ে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লাম। কিন্তু আর ঘুম এল না। একটু পরে পাড়ার মসজিদের মাইকে ফজরের আজান বেজে উঠল। আমার মনে পড়ে গেল ১৭-১৮ বছর আগের দিনগুলোর কথা। চোখের সামনে আমার কৈশোর স্পর্শগন্ধময় জীবন্ত হয়ে দেখা দিল। আমি তখন এরকম ভোরে বাড়ির পাচিল টপকে বেরিয়ে যেতাম। ছবি আজানের শব্দ শুনে জেগে উঠে তার জানালার কাছে থুৎনি রেখে আমার অপেক্ষায় বসে থাকত।

সকালে বউ নাস্তা বানিয়ে আমাকে ডাক দিল। আমি উঠে দেখলাম, রাতে ফ্রিজের মাথা থেকে বিস্কিটের কৌটাটা নামিয়ে ডাইনিং টেবিলের যে জায়গায় রেখেছিলাম, সেটা ঠিক সেখানেই আছে। আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম, গত রাতের কোন কিছুই স্বপ্ন ছিল না।

একইসঙ্গে সতর্কও হতে হল। বউকে কিছুই বললাম না। সে আমাকে খেতে বসার জন্য বললে আমি বললাম, ক্ষুধা নাই, খাব না। সে অবাক হল না, কারণ আমি মাঝেমাঝে এমন করি। কিছু না খেয়ে শুধু এক কাপ চা খেয়ে কাজে চলে যাই। আজ চা-ও খেলাম না।

অফিসে গিয়ে আমি আমার শৈশব-কৈশোরের বন্ধুদের স্মরণ করলাম। দেখা গেল, তাদের মধ্যে মাত্র দু-তিনজনের সঙ্গে আমার এখনও যোগাযোগ আছে। তাদের ফোন করলাম। জানতে চাইলাম, তারা জানে কি না ছবি এখন কোথায় আছে, কী করছে। তারা কেউ কিছুই জানাতে পারল না। পারার কথা নয়। ছবির বাবা সরকারি চাকরি করত। মহকুমায় মহকুমায় বদলি হতে হতে ছবিরা একদিন কোথায় হারিয়ে গেছে।

সন্ধ্যায় অফিসে সহকর্মীদের সঙ্গে ইফতার করলাম। বাসায় ফিরে বউকে বললাম, কাল থেকে রোজা রাখব। সে মুখ টিপে হাসল।

সেদিন ছিল রমজানের ১০ তারিখ। সে-বছর রমজানের অবশিষ্ট ২০টা রোজা আমি রেখেছিলাম। তার পরের বছর থেকে আমি প্রতিটা রোজাই পালন করি। গত পাঁচ বছরে একটা রোজাও নষ্ট করিনি। তবে সেহরি বা ইফতারের নিয়ত আজও শেখা হয়নি। সেহরির সময় প্রতিদিন ব্যতিক্রমহীনভাবে ছবিকে মনে পড়ে। মনে মনে তাকে উদ্দেশ্য করে বলি, রোজা রাখছি। তুমি নিশ্চয় দেখতে পাচ্ছ! কবুল করে নিয়ো। ইফতারের সময় মনে মনে বলি, খেতে বসলাম, তুমি নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ!

ধর্মকর্মে আমার সুমতি হয়েছে ভেবে বউ খুশি। সে-ও এখন প্রতি বছর রোজা রাখে। আমি অবশ্য এখনো নামাজ পড়ি না, কিন্তু বউ রোজার মাসে সকাল-সন্ধ্যা নামাজ পড়ে। প্রতিবেশীদের সঙ্গে আমাদের ইফতারির খাবার বিনিময় হয়, এদিক থেকে আমরা অনেক সামাজিক হয়েছি।

আমাদের সংসারটা আরও ছিমছাম সাজানো-গোছানো হয়েছে। চাকরিতে আমার উন্নতি হয়েছে, বেতন-ভাতা বেড়েছে। আমরা একটা ছোট্ট অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছি। শাদা মোজাইকের মেঝে সারাদিনমান ঝকঝক করে। আলোবাতাসে প্রাণোচ্ছল হয়ে থাকে বাসাটা।

আমাদের মেয়ে বড় হয়েছে, এখন সে বেণী দুলিয়ে স্কুলে যায়। আমাদের সংসারের কোথাও এতটুকু মলিনতা নেই।

আজ রমজানের ১০ তারিখ। এর মধ্যে পাঁচটা বছর চলে গেছে। ছবি আর একটা দিনও আমাকে ফোন করেনি।

পুনশ্চ

প্রিয় পাঠক, পাঁচ বছর আগে রমজান মাসের ১০ তারিখ রাত ৪টায় আবু রায়হান ছবি নামের যে মেয়েটির টেলিফোন কল পেয়েছিল, সে তারও ছয় বছর আগে এক সড়ক দুর্ঘটনায় স্বামী-সন্তানসহ মারা গেছে। আবু রায়হানের সেটা জানা ছিল না। আমি খোঁজ নিয়ে তাকে জানানোর পর সে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে যে সে ওই রাতে স্বপ্ন দেখেছিল। তবুও সে এখন প্রতি বছর রমজান মাসে সব রোজা পালন করে। সেহরি ও ইফতারের নিয়ত সে এখনো শিখেনি। দু'টি মুহূর্তেই সে মনে মনে তার ছবিকে ডেকে বলে, 'তুমি তো দেখছ, কবুল করে নিয়ো।'

আর প্রতি রমজানের ১০ তারিখে একটা টেলিফোন কলের আশায় আবু রায়হান সারা রাত জেগে থাকে।

মশিউল আলম সাংবাদিক, কথাশিল্পী

Coca-Cola

খোলো খুশির জোয়ার!

অনুবাদ গল্প

গৃহপরিচারিকা

অনিতা দেশাই

নগরীর ওপরে সূর্য কিরণ ছড়াচ্ছে। সকাল হতেই পাখপাখলিরা ওড়াউড়ি শুরু করেছে। প্রত্যুষ হতেই কাজকর্ম শুরু হয়েছে। দুধ ও খবরের কাগজ ডেলিভারি দিয়ে গেছে অনেক আগেই। ছোট ছোট বাচ্চারা স্কুল-বাসের জন্যে অপেক্ষা করছে। সমৃদ্ধশালী কসমোপেলিটান নগরীবাসীদের মধ্যে অনেকেই প্রতিদিন সকালে মর্নিং ওয়াক ও জগিং শুরু করেছে। ইতোমধ্যেই রাস্তায় ট্রাফিকের আনাগোনা শুরু হয়েছে। কল সেন্টার ক্লাবের স্টাফ নাইট শিফট শেষ করে দিনের শিফ্‌টের স্টাফের কাছে কাজ বুঝিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরছে। বেশ সকাল থেকে সিটি বাসগুলো চলতে আরম্ভ করেছে। সকাল হতে না হতেই একদল মহিলা শহরের অভিজাত এলাকার নিরাপত্তা প্রহরীর প্রহরাধীন বহুতল বাড়িগুলোর ফটকে অপেক্ষা করতে শুরু করছে। তাদের হাসাহাসি ও বাচালতা কিন্তু তাদের দারিদ্র্যকে ঢেকে রাখতে পারে না। মহিলাদের মধ্যে সোমত্ত, মাঝবয়সী ও বৃদ্ধাও আছে। পরনে সাদামাটা সুতির শাড়ি। শাড়ির আঁচল তাদের শীর্ণ কাঁধের ওপর। পায়ে ছেঁড়া চটি। কয়েকটা যুবতী মেয়ের পরনে সেকেন্ড হ্যান্ড শালওয়ার-কামিজ, মাথায় দোপাট্টা।

আমাদের মত গরীবদের জন্য এইসব ধনী মানুষের একটুও দয়ামায়া নেই। এরা কি আমাদের মত মানুষদের জীবনসংগ্রামের কথা অনুভব করতে পারে? এরা সব রকমের সুযোগসুবিধা ভোগ করছে– সুন্দর বাড়ি, বাথরুম, জলের সুব্যবস্থা, কিচেন আর প্রচুর খাবারদাবার। অথচ আমাদের বেঁচে থাকার মত প্রয়োজনীয় খাবারই নেই।

প্রত্যেকটা মহিলার হাতেই ছোট্ট কাপড়ের ব্যাগ, তার মধ্যে তাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। তাদের অবিরাম হাস্যকৌতুক পথচারীদের নজর এড়ায় না। তারা একবার তাদের দিকে তাকিয়ে দ্বিতীয়বার আর তাকায় না। মহিলাদের দলটি গেটে পৌঁছে গার্ডদের নিজ নিজ আইডেনটিটি কার্ড দেখায়। কার্ড প্রমাণ করে যে, সে একজন গৃহপরিচারিকা। প্রত্যেকটি আইডি কার্ডে পরিচারিকার ছবি, নাম, যে অ্যাপার্টমেন্টে কাজ করে তার নম্বর এবং কার্ড ইস্যুকারী কর্তৃপক্ষের নাম রয়েছে।

নগর ও শহরের উন্নতি হওয়ায় সেখানকার আকাশচুম্বী অট্টালিকার ধনী বাসিন্দাদের গৃহস্থালির ঝাড়াপোঁছা, বাসনকোসন মাজা, রান্নাবান্না, ছেলেমেয়ে পরিচর্যার জন্য গৃহপরিচারিকার চাহিদা প্রচুর বেড়ে গেছে। গৃহপরিচারিকারা নিজেদের বস্তিবাড়ির কাজকর্ম সেরে বিবাহিতা মহিলাদের পার্ট-টাইম কাজ করতে পছন্দ করে। অন্য দিকে অবিবাহিতা যুবতী মেয়েরা গৃহপরিচারিকা হিসেবে ফুল-টাইম কাজ করতে চায়। পাশের রাজ্য এমনকি পাশের দেশ থেকেও দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিকরা নগরে ভিড় করে কাজের আশায়। স্থানান্তরী পুরুষ ও মহিলা শহর ও নগরে আসে ভাল আয়-উপার্জন ও ভালভাবে জীবন যাপনের স্বপ্ন নিয়ে। পুরুষেরা ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টরে কাজ পায়, অনেকে সিকিউরিটি সার্ভিসেও কাজ নেয়। অধিকাংশ মহিলাই গৃহপরিচারিকার কাজ করে। সাত-আট বছরের বাচ্চা ছেলেমেয়েরাও কায়িক প্রশ্রম করতে নগরীতে আসে।

প্রহরীরা রাতের শিফ্‌টে বারো ঘণ্টা কাজ শেষে পরবর্তী শিফ্‌টের প্রহরীর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে। শিফ্‌ট পরিবর্তনের সময় প্রহরীদের তাদের কার্ড দেখিয়ে এন্ট্রি রেজিস্টারে সইসাবুদ করতে হয়।

'কেমন আছ শঙ্কর?' মেয়েদের দলের মাঝ থেকে একজন প্রহরীটিকে জিজ্ঞেস করে। প্রহরীটির একটুও কথা বলতে ইচ্ছে করে না, সে শুধু একটু ঘাড় নাড়ায়। মেয়েদের দলটির মধ্যে কালো রঙের মাঝবয়সী এক মহিলা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তার মলিন মুখে দুঃচিন্তার ছাপ স্পষ্ট। 'ও গীতা! তুই কোথায় কী হারিয়েছিস, তুই কি তোর স্বামীর স্বপ্নে বিভোর?' একজন খিক খিক করে হেসে গীতাকে বিদ্রুপ করলে অন্যরা হাসতে শুরু করে। 'গীতা, আইডি কার্ড দেখিয়ে ৭০২ওয়ালি মেমসাবের ওখানে দৌড় লাগা, না হলে আজও তোর লেট হবে।' মহিলারা ব্যঙ্গ করে গীতাকে বলল। গীতা তাদের কথা শোনার পর তড়িঘড়ি করে এগিয়ে গিয়ে গার্ডকে তার আইডি কার্ড দেখাল। বন্ধুদের প্রতি কষ্টের হাসি হেসে স্বাভাবিক থাকার ভান করে সে তাদের পিছু পিছু গেট পেরিয়ে ভেতরে গেল। অন্য মহিলারা যে-যার কাজের জায়গার দিকে পা বাড়াল।

গীতা কমপক্ষে চারটা বাড়িতে ঝাড়াপোঁছা, বাসনকোসন মাজার কাজ করে। তিনবছর আগে স্বামী প্রকাশ ও দুটো সন্তানের হাত ধরে সে এই নগরীতে এসেছে। তাদের বাড়ি অজপাড়াগাঁয়ে। সেখানে একদিনের জন্য পেটপুরে খাবার জুটত না। প্রকাশ একটা সাইকেল রিক্সা চালাত আর গীতা গ্রামের কয়লার খনিতে দিনমজুরিতে কয়লা ভাঙত। যা আয় হত তাতে সংসার চালাতে না পেরে গ্রামের অনেকের মত প্রকাশও বড় নগরীতে পাড়ি জমায়। চারজনের পবিবার নিয়ে নগরীর নোংরা গলির ধারের ১০ বাই ১২ ফুট একটা খুপড়িতে তাদের নতুন জীবন শুরু হয়। প্রকাশ স্থানীয় একটা কারখানায় দিনমজুরের কাজ করে আর গীতা আকাশচুম্বী অট্টালিকার আবাসিক এলাকার ফ্ল্যাটে ফ্ল্যাটে গৃহস্থালির কাজ করে।

গীতা আশা নামে এক চাকরিজীবী মহিলার বাসায় পার্ট টাইম কাজ করে। সে ৭০২ নম্বর অ্যাপার্টমেন্টের ডোর বেল বাজায়। সব পরিচারিকারা সাধারণত আশার অ্যাপার্টমেন্টকে '৭০২ওয়ালি মেমসাব' বলে থাকে। 'আজও দেরি করে এসেছিস, গীতা! ব্যাপারটা কী, তুই বুঝতে পারিস না, কেন আমি তোকে সকাল সকাল আসতে বলি?' আশা ক্রুদ্ধ কণ্ঠে কথগুলো বলতে বলতে দরজা খুলে দেন। আশা ভাবেন গীতা হয়তো অন্য কোথাও কাজ করে আসার কারণে রোজ দেরি করে তার এখানে আসে। 'তুই কি আমার এখানে কাজের সময়ে অন্য কোথায়ও কাজ করিস্? আমাকে অফিসে যেতে হয়, আর তোর কারণে আমার অফিসে যেতে দেরি হয়ে যায়। এমনটা করতে থাকলে আমি বেতন থেকে টাকা কেটে নেব বলে দিচ্ছি'।

আশা মাঝবয়সী রাগী স্বভাবের মহিলা। আশা ও তার স্বামী উভয়েই একটা ম্যাল্টিন্যাশনাল কোম্পানিতে চাকরি করেন। তাদের একমাত্র মেয়ে ধারেকাছের ইন্টারন্যাশানাল হাই স্কুলে পড়ে। সুশিক্ষিত ও তিন সদস্যের আভিজাত্যপূর্ণ পরিবারে আয়-উপার্জন উল্লেখ করার মত। আশার ভ্রূকুটি ও কৈফিয়তের জবাব না দিয়ে গীতা রান্নাঘরের ব্যালকনির কাপবোর্ডে রাখা ঝাড়ু, ডাস্টার ও কাজের সরঞ্জাম নিয়ে ঝাড়ু দিতে শুরু করে।

জাঁকজমকপূর্ণ এই নগরীতে গীতা তিনবছর আছে, এ সময়ের মধ্যে সে বেশ কয়েকটি বাসায় কাজ করেছে। তাকে এখন মেমসাবের হম্বিতম্বি চিৎকার চেঁচামেচি রাগারাগির মধ্যে কাজ করতে হচ্ছে। গীতা মেমসাবের তীর্যক মন্তব্য ও রাগের প্রতিবাদ করে না। যদিও অন্যান্য গৃহপরিচারিকারা মাঝেমাঝেই তাকে উপদেশ দেয় খ্যাপাটে ও রাগী মহিলার বিরুদ্ধে সোজা হয়ে দাঁড়াতে। গীতা কারো সঙ্গেই বাদ-প্রতিবাদ করতে পারে না। তার বন্ধুদের অনেকে এক বছরের মধ্যে গৃহকর্ত্রীর খ্যাপাটে ও রাগী স্বভাবের কারণে কয়েকবার কাজ ছেড়েছে।

'তুই কথার উত্তর দিচ্ছিস্ না কেন, কেন দেরি করে এলি? অনেক টাকা-পয়সা ও খাবার তোর পেটে গেছে, আমাদের মত ভাল মানুষ পেয়ে তুই রোজই দেরি করে আসছিস্।' আশা তার গৃহপরিচারিকাকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করে চললেন। অতিষ্ঠ হয়ে গীতা ঝাড়ু দেওয়া বন্ধ করে তার দেরিতে আসার কারণ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করল, 'দিদি, আমাকে ওষুধের দোকানে যেতে হয়েছিল...'

'মিথ্যে বলবিনে। প্রত্যেক দিনই তুই একটা না একটা অজুহাত খাড়া করিস্।' আশা রুঢ় কণ্ঠে বললেন।

'মা, আমার স্কুলের দেরি হয়ে যাচ্ছে। আমার লাঞ্চ বক্স কি রেডি হয়েছে?' আশার হৈ-হল্লায় বিরক্ত হয়ে তার মেয়ে চেঁচিয়ে উঠল। আশা মেয়ের কথা ভুলেই গিয়েছিলেন, দ্রুত কিচেনের দিকে দৌড়ে গিয়ে লাঞ্চ প্যাক করতে শুরু করলেন। এর ফলে গীতা স্বস্তিবোধ করে আবার ঝাড়ু দিতে শুরু করল।

কাজ করতে করতে গীতার মনে হাজার রকমের চিন্তা দেখা দিল, সে ভাবল, আমাদের মত গরীবদের জন্য এইসব ধনী মানুষের একটুও দয়ামায়া নেই। এরা কি আমাদের মত মানুষদের জীবনসংগ্রামের কথা অনুভব করতে পারে? এরা সব রকমের সুযোগসুবিধা ভোগ করছে– সুন্দর বাড়ি, বাথরুম, জলের সুব্যবস্থা, কিচেন আর প্রচুর খাবারদাবার। অথচ আমাদের বেঁচে থাকার মত প্রয়োজনীয় খাবারই নেই। একটু দেরিতে আসায় আশাদিদি চিৎকার চেঁচামেচি করে নরক গুলজার করে তুলছেন। কার কাছে আমি অভিযোগ করব!

আশা তার মেয়েকে সাজিয়েগুছিয়ে মুখে চুমু দিয়ে হাত নেড়ে হাসি হাসি মুখে স্কুলে পাঠিয়ে দিয়ে গীতার দিকে ভ্রূকুটি করলেন। সে সময় গীতার মনে পড়ল তার দুই বাচ্চার কথা, যাদের সে বস্তির খুপড়িতে একলা রেখে এসেছে। সে তাদের সারাদিনের জন্য সামান্য খাবার রেখে এসেছে।

দেখ, ওরাও মহিলা। ওদেরকেও তাদের স্বামী-সংসার সামলাতে হয়। এরা সংসার সামলিয়ে অফিসে কাজ করে। ওদেরকেও ব্যর্থতা, নিরাশা, হতাশায় ভুগতে হয়। আর এসব কারণে ওইসব মহিলাদের মনে রাগের সৃষ্টি হয়, সেই রাগ তারা কার ওপরে ঝাড়বে, তাই তাদের রাগ আমাদের ওপর ঝাড়ে।

সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ঝাড়ু দেওয়া শেষ করে রান্নাঘরের দিকে গেল বাসনকোসনের গাদা মাজার জন্য। গীতা তখনো শুনতে পেল, আশা তার শোবার ঘর থেকে বিষোদ্গার করেই চলেছে।

টেলিফোন বেজে উঠতেই আশা দৌড়ে গিয়ে ফোন ধরলেন। তার এক বান্ধবী তার গৃহপরিচারিকা সম্বন্ধে জানতে চাইলে আশা গীতার দুর্নাম করেই চললেন– দেরিতে আসা তার বদ-অভ্যাস; ভালভাবে থালাবাসন পরিষ্কার করে না, ইত্যাদি, ইত্যাদি। 'তুমি তো জানই এরা সব সময়ই অকৃতজ্ঞ হয়ে থাকে। কী করতে পারি। সব সময়ই আমাদের সাথে প্রতারণা করে। চুরিচামারি করে, লক্ষ্য না করলে এটা-ওটা সরিয়ে ফেলে। এরা সবাই একই রকমের।' আশা ফোনে একনাগাড়ে বলতে লাগলেন। সব শুনেও সে আগের মত চুপ করে রইল।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কাজ সেরে চলে যাওয়ার জন্য তৈরি হলে আশা সতর্কবার্তা উচ্চারণ করলেন, 'আর দেরি করে আসবিনে, কথা না শুনলে তোকে ছাড়িয়ে দেব। আমার বাড়িতে কাজ করার জন্য সবাই মুখিয়ে আছে।' সে সময় আশা অফিসে যাবেন বলে স্বামীর সঙ্গে ব্রেকফাস্টের জন্য রেডি হচ্ছিলেন। গীতা তার দিকে শূন্যদৃষ্টিতে তাকিয়ে মাথা নীচু করে শাড়ির আঁচলে হাত মুছতে মুছতে দরজার দিকে এগোল। সে সময়ও আশা তাকে ভর্ৎসনা করতে ছাড়লেন না। তার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেওয়ার সময় গীতার চোখে পড়ল অ্যাপার্টমেন্টের ভেতরের সাজসজ্জার ওপর। সব রকমের বিপদ আপদ থেকে রক্ষা করার ও সংসারের সমৃদ্ধির জন্য তাদের শোবার ঘরের দরজার সামনে দামী গয়নায় সুসজ্জিত গণপতির মূর্তি।

'কেমন করে এই বাড়িতে সুখ-সমৃদ্ধি থাকে? এ ধরনের কটুকথা ও গালাগালির পরেও!' কয়েক সেকেন্ড ধরে কথাটা ভেবে গীতা ওখান থেকে যাওয়ার জন্য লিফটের দিকে পা বাড়াল।

এ-ই হচ্ছে গীতার দিনের প্রথম কাজের ফিরিস্তি। কাজ শেষ করে গীতা মেইন গেটের বাইরে এলে একই কমপ্লেক্সের অন্যান্য বাসায় কাজ করা গৃহপরিচারিকাদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হল। ছায়া তার বন্ধু, তাদের বস্তির ঘরের পাশের ঘরেরই থাকে। সে অন্যান্য পরিচারিকাদের সঙ্গে কথা বলছিল। তাকে দেখতে পেয়ে ছায়া স্বস্তিবোধ করল। 'তোর আজকের কাজ শেষ, গীতা?'

বিষণ্নদৃষ্টিতে তাকিয়ে গীতা মাথা নাড়ল।

'চল তাহলে একসঙ্গে বাড়ি ফিরি।' ছায়া খোশমেজাজে বলল। গীতার বিষণ্ন মুখটা দেখতে পেয়ে ছায়া জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে? ৭০২ওয়ালি মেমসাব কি আবার তোকে বকেছে?'

গীতা মাথা নেড়ে হ্যাঁ-সূচক জবাব দিল। ছায়া তার মাথা নাড়িয়ে ভাবল, ওর ওপর ওর মেমসাব যা করে আসছে, আজও তাই করেছে। 'আয় ওই গাছটার নিচে বসে শুনি, আজ আবার কী হয়েছে?'

তারা দু'জনে গাছের ছায়ায় বসে তাদের কর্মক্লান্ত মুখের ঘাম মুছল। ততক্ষণে গীতা কাঁদতে শুরু করেছে। একটানা কান্নাকাটি করায় তার পরনের সুতির শাড়ি ভিজে গেল। জীর্ণ শরীরে ঢলঢলে ব্লাউজটা বেমানান লাগছে। পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় একটা গার্ড কটূক্তি করে গেল। তারা তার দিকে তাকিয়ে দেখলমাত্র। ছায়ার সঙ্গে পলিথিনের একটা ভারি ব্যাগ। সেটা সে পাশের একটা পাথরের ওপর রাখল। গীতা ব্যাগের দিকে তাকালে ছায়া বলল, '৪০৪ওয়ালি মেমসাব গতরাতে একটা পার্টি দিয়েছিলেন। পার্টিতে বেঁচে যাওয়া খাবার আমাকে দিয়েছেন। বাচ্চাকাচ্চারা আজ একটা ফিস্ট খেতে পারবে।'

'যাক, গীতা বল আজ আবার কী হয়েছে?' ছায়া উদ্বেগের সঙ্গে জানতে চাইল। গীতা আজকের দিনের ঘটনাগুলো তাকে বলে দু'চোখের জল ফেলতে লাগল আর আশার কটূক্তির কথা ভাবতে লাগল।

'দুঃচিন্তা করিস না। এ ধরনের ঘটনা আমাদের প্রত্যেকের ওপরই ঘটছে। আমরা ওই সব সমস্যা মানিয়ে নিয়েই কাজ করে চলছি। তাদের অনেক অনেক টাকা পয়সা আর সুখ শান্তি আছে।' গীতাকে সান্ত্বনা দিয়ে ছায়া দু'হাতে তার কাঁধ জড়িয়ে ধরে বলল, 'আমি তোকে কতবার বলেছি তুই ওখানকার কাজ ছেড়ে দে। কিন্তু তুই তো কানেই তুলিস না। এখনই তুই ওখানকার কাজ ছেড়ে দে। আমি সবাইকে বলব তোকে ভাল জায়গায় একটা কাজ খুঁজে দিতে।'

নগরীতে আসার পর থেকেই ছায়া জানে তাদের কাজের একটা কূটকৌশল আছে, আর এ জন্য কাজের মেয়েরা তাকে পছন্দ করে।

'তুই তো জানিস আমি আশাদিদির কাজ ছাড়তে পারব না। আমি তার কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়েছি। ধার শোধ না করা পর্যন্ত কাজ ছাড়ার উপায় নেই আমার।' গীতা তার দুরবস্থার কথা বলল।

তার কথা শুনে ছায়া ধীরে ধীরে মাথা নাড়াল।

'তুই জানিস, এই সব মহিলারা আসলে তাদের ব্যর্থতা, নিরাশা আর হতাশা থেকে আমাদের ওপর গালিগালাজ করে।' ছায়ার সুচিন্তিত অভিমত।

'তুই কী বলতে চাচ্ছিস?' গীতা ভ্রূ কুঁচকে জানতে চাইল।

ছায়া গীতার হাতটা তার হাতের মধ্যে নিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে লাগল, 'দেখ, ওরাও মহিলা। ওদেরকেও তাদের স্বামী-সংসার সামলাতে হয়। ওরা সংসার সামলিয়ে অফিসে কাজ করে। ওদেরকেও ব্যর্থতা, নিরাশা, হতাশায় ভুগতে হয়। আর এসব কারণে ওইসব মহিলাদের মনে রাগের সৃষ্টি হয়, সেই রাগ তারা কার ওপরে ঝাড়বে, তাই তাদের রাগ আমাদের ওপর ঝাড়ে।' ছায়া গীতার হাত শক্ত করে ধরল।

ছায়াকে হঠাৎ চিন্তান্বিত দেখাল, তার চোখ দুটো মাটির দিকে, সে পায়ের আঙুল দিয়ে মাটি খুড়তে লাগল। তারপর বাস্তবে ফিরে এসে প্রথমে আস্তে আস্তে পরে জোরে জোরে বলল, 'ওদের সংসারজীবন আর আমাদের সংসারজীবনের মধ্যে আকাশ-পাতাল ফারাক।ওদের স্বামীরা ওদের হাত দিয়ে মারে না, কথা দিয়ে মারে... আর তার ফলেই ওদের বউরা আমাদের ওপর ঝাল ঝাড়ে।'

গীতা তার বন্ধুর দিকে মুগ্ধ চোখে তাকাল। দিনের আলোয় এবারই সে ছায়ার দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, 'তুই তো স্কুলের মাস্টারনীদের মত সব কিছুতেই চটপটে।' তারপর জীবনের দুঃখ ভুলে দুই বন্ধু শব্দ করে হেসে উঠল। 'তোর কথাই ঠিক। আশাদিদি কটূক্তি করলেও কিন্তু প্রয়োজনের মুহূর্তে আমাকে সাহায্য করতে ইতস্তত করে না।' গীতা বলে চলল, 'তোর কথাই ঠিক, আশাদিদিকে অফিস চালাতে হতাশার মধ্যে থাকতে হয় আর বাড়িতেও একই অবস্থা। তার স্বামী অধিকাংশ সময়ই বাইরে বাইরে সফর করে বেড়ান।'

হঠাৎ ছায়ার মনে পড়ল গীতার বাড়ির গতরাতের ঘটনার কথা। সে কথায় কথায় তাকে জিজ্ঞেস করল, 'গতরাতে কী হয়েছিল রে, প্রকাশ তোকে মারধর করল কেন?'

গীতা দুঃখের হাসি হেসে হাতের ফ্যাকাশে হয়ে যাওয়া কাচের চুড়ি নাড়িয়ে ছায়ার প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলতে শুরু করল, 'একটা সাইকেল কেনার জন্যে প্রকাশ আমাকে আশাদিদির কাছ থেকে টাকা ধার করে আনতে বলল। প্রত্যেকদিন হেঁটে

দু'কিলোমিটার দূরে কারখানায় যেতে তার কষ্ট হচ্ছে– এ জন্যে তার সাইকেল দরকার। আমি এর মধ্যে আরো তিন বাড়িতে ধার করেছি। আশাদিদির কাছ থেকে ধার করলে শুধব কিভাবে? টাকা ধার করতে অস্বীকার করায় আমাকে মারধর করে।' গীতা কিছু সময়ের জন্য নীরব থেকে কী যেন ভেবে বলতে থাকল, 'মারধরের ফলে আমার গায়ে ব্যথা হওয়ায় সকালে গিয়েছিলাম ওষুধের দোকানে, তাই কাজে আসতে দেরি হয়। আশাদিদি তো জানে না, কারো বোঝার কথাও নয়'। গীতা তার দুঃখের কথা বলতে বলতে অজান্তেই পাশের ঝোঁপ থেকে একটা পাতা ছিঁড়ে আঙুল দিয়ে মোচড়াতে থাকে।

দুই মহিলা সেখানে নীরবে কিছুটা সময় বসে ভাবনায় বিভোর হয়ে একসময় দীর্ঘশ্বাস ফেলল। তারা হয়তো তাদের দুঃখ-কষ্ট থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার কথা ভাবছিল। পাশের গাছটির পাতায় মর্মরধ্বনি উঠল, তাদের কাছে সঙ্গীতের মত লাগল। দুই বন্ধুর দুঃখের মাঝে পাতার মর্মরধ্বনি যেন সান্ত্বনা হয়ে বাজল। এক সময় তারা ভাবনার জগৎ থেকে বাস্তবে ফিরে এল। তারপর ওখান থেকে উঠে পড়ল। ততক্ষণে অন্যান্য গৃহপরিচারিকাদের গেটে আইডি কার্ড দেখিয়ে বের হয়ে আসতে দেখা গেল। সবাই তাদের আস্তানার উদ্দেশ্যে যাত্রা করছে। এইসব মহিলারাই একদিন সুখী জীবনের প্রত্যাশায় অনেক আশা-ভরসা নিয়ে নগরীতে এসেছিল।

অনুবাদ **মনোজিৎকুমার দাস**

লেখক পরিচিতি

ইংরেজি ভাষার প্রখ্যাত ভারতীয় লেখক অনিতা দেশাইয়ের জন্ম মুসৌরিতে ১৯৩৭ সালের ২৪ জুন। তাঁর বাবা বাঙালি আর মা জার্মান। শিক্ষালাভ দিল্লিতে। বাবার উপাধি 'মজুমদার' এবং স্বামীর উপাধি 'দেশাই' হওয়ার তাঁর নাম অনিতা মজুমদার দেশাই হলেও লেখালেখির জগতে তিনি অনিতা দেশাই নামে পরিচিত। তাঁর কন্যা কিরণ দেশাই বুকার প্রাইজ প্রাপ্ত বিখ্যাত লেখক।

অনিতার প্রথম উপন্যাস *ক্রাই দি পিকক্* ১৯৬৩ সালে প্রকাশিত হয়। তাঁর নাম তিন-তিনবার বুকার প্রাইজ শর্টলিস্টের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৭৮ সালে তাঁর *ফায়ার অন দি মাউন্টেন* উপন্যাস উইনিফ্রেড হোল্টবি মেমোরিয়াল প্রাইজ পায়। একই বছরে উপন্যাসটির জন্য তিনি সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৮০ সালে *ক্লিয়ার লাইট অফ ডে* উপন্যাসের জন্য তাঁর নাম বুকার প্রাইজ শর্টলিস্টে ওঠে। ১৯৮৩ সালে তিনি *দ্য ভিলেজ বাই দি সি অ্যান ইন্ডিয়ান স্টোরির*

জন্য গার্ডিয়ান চিলড্রেন'স ফিকশন প্রাইজ লাভ করেন। ১৯৮৪ সালে *ইন কাস্টডির* জন্য দ্বিতীয়বারের মত তাঁর নাম বুকার প্রাইজ শর্টলিস্টের অন্তর্ভুক্ত হন। ১৯৯৩ সালে তিনি নেইল গান ইন্টারন্যাশানাল ফেলোশিপ অর্জন করেন। ১৯৯৯ সালে *ফাস্টিং ফিস্টিং* উপন্যাসের জন্য তাঁর নাম আবারও বুকার প্রাইজ শর্টলিস্টে উঠে।

অনিতা ২০০০ সালে *আলবার্তো মোরাভিয়া প্রাইজ ফর লিটারেচার* (ইটালি), ২০০৩ সালে *বেনসন মেডেল অফ রয়াল সোসাইটি অফ লিটারেচার* অর্জন করেন এবং ২০০৭ সালে তিনি সাহিত্য অ্যাকাডেমি ফেলোশিপ লাভ করেন। ২০১৪ সালে ভারত সরকার তাঁকে সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতিস্বরূপ 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করে।

অনিতা দেশাই মাউন্ট হোলিওক কলেজ, বারউচ কলেজ ও স্মিথ কলেজে দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করেন। ১৯৯৩ সালে তিনি ম্যাসাচুসেটস্ ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে ক্রিয়েটিভ রাইটিং টিচার হিসেবে যোগ দেন। ২০০৪ সালে মেক্সিকোর ওপর তাঁর উপন্যাস *দ্য জিগজ্যাগ* প্রকাশিত হয়। ২০১১-য় তাঁর সর্বশেষ ছোটগল্পের সংকলন *দ্য আর্টিস্ট অফ ডিসঅ্যাপিয়ারেন্স* প্রকাশিত হয়। ২০১৪ সালের 'উইমেনস ডে' উপলক্ষ্যে অনিতা দেশাইয়ের ইংরেজি ভাষায় লেখা 'দ্য ডোমেস্টিক মেইড' গল্পের বঙ্গানুবাদ 'গৃহপরিচারিকা' নামে এখানে পত্রস্থ হল। এ গল্পে ভিন্ন রাজ্য এমনকি অন্য দেশের গ্রাম থেকে নগরীর অভিজাত আবাসিক এলাকার আকাশচুম্বী অট্টালিকায় ধনী লোকজনের গৃহে গৃহপরিচারিকা হিসেবে কাজ করতে আসা বস্তিবাসী দারিদ্র্যপীড়িত মহিলাদের করুণ কাহিনি বিধৃত হয়েছে। ●

ঘটনাপঞ্জি ❖ এপ্রিল

সুচিত্রা সেন

০৬ এপ্রিল ১৯৩১	❖	সুচিত্রা সেনের জন্ম
০৯ এপ্রিল ১৮৯৪	❖	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মৃত্যু
০৯ এপ্রিল ১৯৫০	❖	আইসিসিআর-এর প্রতিষ্ঠা
১০ এপ্রিল ৫৮৯ খ্রি.পূ.	❖	গৌতম বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভ
১০ এপ্রিল ১৯০১	❖	অমিয় চক্রবর্তীর জন্ম
১২ এপ্রিল ৫৯৯ খ্রি.পূ.	❖	জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের জন্ম
১৪ এপ্রিল ১৮৯১	❖	ড. বি আর আম্বেদকরের জন্ম
১৫ এপ্রিল ১৮৭৭	❖	দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদারের জন্ম
১৬ এপ্রিল ১৮৮৫	❖	বিপ্লবী উল্লাসকর দত্তের জন্ম
১৭ এপ্রিল ১৯৭৫	❖	সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণনের মৃত্যু
১৮ এপ্রিল ১৮০৯	❖	হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর জন্ম
২৩ এপ্রিল ১৯৯২	❖	সত্যজিৎ রায়ের মৃত্যু
২৬ এপ্রিল ১৯২০	❖	অংকবিদ শ্রীনিবাস রামানুজনের মৃত্যু

BE 100% SURE

Dettol

BPMPA

Proud Partner of icddr,b

ডেটল সাবান সুরক্ষা দেয় ১০০ রোগবাহী জীবাণু পর্যন্ত#

বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত যে নতুন ডেটল সাবান আপনার পরিবারকে ১০০টি পর্যন্ত রোগবাহী জীবাণু থেকে সুরক্ষা দেয়। এজন্যই ডাক্তাররা সবসময় পরামর্শ দিয়ে আসছেন ডেটল ব্যবহার করার জন্য।

নতুন

সুরক্ষা দেয়

১০০

রোগবাহী জীবাণু পর্যন্ত#

This is supported by Microbiological assessments versus bacteria and fungi at an external GLP facility (Bioscience Laboratories, Bozeman, Montana, USA)

** Dettol Original Soap is a Grade-1 soap

DettolBD

ধা রা বা হি ক উ প ন্যা স

রূপকথা ভূতকথা ভালবাসা

সালেহা চৌধুরী

(পূর্ব প্রকাশিত-র পর)

বত্রিশ.

ছাদের আলসেতে দাঁড়িয়ে অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে অনেকগুলো দিন চলে গেল। মাঝে মাঝে মমতা, কাজল। কখনো পবিত্র। পেয়ারা গাছের চেনা পাখিরা কি বুঝে ফেলল কাজল আজকাল আর ঠিক আগের মত নেই। ওরা আসে, ফল খায়, উড়ে যায়। গিরিগিটিরা যথারীতি। তক সাপের ডাকও শোনা যায় কখনো।

মমতা ও পবিত্র আরো কাছাকাছি এখন। ওদের মাঝখানে কাজল এখন তৃতীয় ব্যক্তি। ঢাকা থেকে মিঠুপার চিঠি আসে। কেবল একটি চিঠিতে পান্নার কথা ছিল। পান্নাকে শুভেচ্ছা। এমনি কোন সাধারণ কথা। বড় ব্যস্ত মিঠুপা। ওর আর বিএ পড়া হয়নি। কানের কাছ দিয়ে একটা প্রথম বিভাগ পাবার পরেও। পরে সম্ভব হলে সে পড়বে। তেমন কথাও লেখা ছিল। কিছু উপদেশ, কিছু ভালবাসা, কিছু উদ্বেগ। এসব লেখার দু'লাইনের মাঝখানে অদৃশ্য আদর। ফুপুর ছেলে মোশফেকভাইয়ের চিঠি এল। ওর ডাক নাম বুলবুল।

কাজল
ভাল আছিস তো। সামনে আমার পরীক্ষা। পরীক্ষার পর বেড়াতে আসতে পারি।
বুলবুল

মোশফেককে মনে পড়ল। বেশ একটু গল্প-পাগল মানুষ। কিন্তু গল্পগুলো বোরিং। মানুষ ভালই। তবে তিনি বড়দের সঙ্গে কথা বলতে পছন্দ করেন।
কাজল ঝুঁকে পড়ে দেখে নানা সব আইসক্রিম নকুলদানাদের চলে যাওয়া। বর্ষা ছাপানো এক দিনে আব্বা হাতে এক জরুরি চিঠি নিয়ে এলেন।

ঘোরলাগা গভীরতা কাকে বলে জানিস কাজল? মমতার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারল না ও।
জানি না। বললো কাজল।
আমি জানি। মমতা বলে।

আব্বার চিঠিটা বদলির খবর। পাঁচ বছর ফরিদপুর কাটিয়ে এবার তিনি রংপুর যাবেন। বদলির সঙ্গে একটু বেতন বাড়ল এইটুকুই সুখবর। মা বললেন– বেতন বাড়লেই মা ওকে একটি মটরমালা বানিয়ে দেবেন। মার খুশির কথা কাজল জানে। অন্যের জন্য কিছু করতে পারা। রংপুর কেমন হবে? ভাবল ও। নিশ্চয়ই ফরিদপুরের মত নয়। সে জানে পৃথিবীর আর কোন জায়গা ফরিদপুরের মত হতে পারে না।

সাজো সাজো রব চারদিকে। গোছানো, প্যাকিং– সে এক মহা হুলুস্থুল কারবার।

স্কুলের মেয়েরা ফেয়ারওয়েল দিল ওকে। চাঁদা তুলে বই কিনল। রেবা, ঝর্না, মুশতারি, হামিদা, আরতি, নাসিম এবং আরো অনেকের সঙ্গে মিষ্টি খেল কাজল। তারপর রূপালি সিনেমায় 'মরণের পরে' দেখল। ওরা ওকে চিঠির কাগজ আর কলম উপহার দিল। মমতার চোখ ছল ছল। অনেকবারই গলা ধরে আসে তার। ভালবাসার ঝিল থেকে উঠে এসে কাজলের গলা ধরে। পারুল বলে– পান্নাভাই এসে এ খবরে খুব মন খারাপ করবে।

কবে আসবে দেশত্যাগী এই মানুষ?

কবে? যে-কোনদিন। আব্বাজান জরুরি চিঠি লিখেছেন আসার জন্য।

এখানকার স্কুল বেশ ছিল। রংপুরের স্কুল কেমন হবে কে জানে?

এতিমন আপা স্কুলের মধ্যে থাকেন। তিনি আব্বাকে বললেন– ওকে রেখে যান আমাদের কাছে। আব্বা অবশ্যই এমন প্রস্তাবে রাজি হলেন না।

একা একা স্কুলে যেতে আমার ভাল লাগবে নারে কাজল। ধরা গলায় মমতা বলে।

একদিন আর আমার কথা মনেও পড়বে না।

সে একদিন আসতে সময় লাগবে।

তোর আর কি? নতুন জায়গা, নতুন বন্ধু, নতুন স্কুল। আমাদের ভুলতে খুব বেশি হলে এক সপ্তাহ।

তোর তাই মনে হয়।

মমতা এরপর আর কিছু বলে না। – অন্য কেউ আসবে 'নিরিবিলিতে'। বলে ও।

অন্য কেউ। কিন্তু কাজল নয়।

পারুল ওর হাত ধরে বলে– আব্বাজান যা শুরু করেছেন হয়তো দেখেশুনে এক শুভদিনে গলায় চাকু বসাবেন।

ইস বর বর করে কত সব গল্প এখন আবার বলা হচ্ছে চাকু বসাবেন।

পারুল বলে– চাকুই তো। আমার তো নিজের পছন্দে কিছু হবে না। চাকু ছাড়া আর কি?

থাক থাক নিজেকে আর মুরগির সঙ্গে তুলনা করিস না। তারপর বলে– জানিস পারুল তোরা যে আমার কতখানি ছিলি আমি ঠিক কথা দিয়ে তা বোঝাতে পারব না। – থাক তাহলে বোঝানোর চেষ্টা করিস না। আমি জানি। তারপর দু'জনে কিছু সময় হাত ধরে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। বিকেল আর সন্ধ্যার মাঝামাঝি সময়ে। সন্ধ্যার পাউডার মেখে দু'জনে তাকিয়ে রইল ভবিষ্যতের দিকে। পারুল বলল– আমার মন বলছে তোর সঙ্গে আমার আবার দেখা হবে। দেখা না হলেও কথা হবে।

তাই। কাজল বলল– সে কতদিন পরে রে পারুল?

ভবিষ্যত জানে কতদিন পরে।

কিন্তু একদিন দেখা হবেই।

তেত্রিশ.

আলিপুরের লাল সুড়কির পথ বেয়ে রিকশার কনভয়। পেছনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে কাজলের 'নিরিবিলি'। মমতার দু'চোখ বাঁধ মানতে রাজি নয়। ভিজে গেল শাড়ির আঁচল। সুহাসিনীমাসি ও মা এই প্রথমবারের মত গলা ধরে কাঁদলেন। পারুল বলে– আমি চিঠি লিখতে ভালবাসি। সব খবর তোকে জানাব চিঠিতে। তুই কিন্তু উত্তর দিস। চকলেটের বাক্স এবং একটি গিফ্‌ট কার্ড হাতে দিয়ে পবিত্র বলে– আমার আবার চিঠিফিটির অভ্যাস কম। তুই লিখলে জবাব দেব।

কাজল ঘাড় কাত করে বলে– ও চিঠি লিখবে। কাজল কাঁদছে। শব্দ নেই। কোন এক লেখক বলেন সমুদ্রের ওপারের বিষ্টির মত তেমন। – কি সব বাজে ছেলেমানুষী– এই বলে পবিত্র পকেট থেকে রুমাল বের করে। 'নিরিবিলির' চারপাশের অসংখ্য গাছের ভেতর থেকে গিরগিটি তক এবং একটি কাঠবেড়ালি কাজলকে দেখে নেয়। সর সর শব্দ। অনেকটা ঝড়ের মত। যদি গাছেরা কথা বলতে পারত হয়তো বলত– কাজল যেয়ো না। আর পারে না বলেই পাতায় শব্দ তোলে। পাতায় খবর পাঠায়। কখনো সর সর কখনো টুপ টাপ। কখনো নিঃশব্দ পতন। কখনো স্তব্ধ। সেই কাঠবেড়ালিটা না? লেজ তুলে দেখে নেয় কাজলকে।

এক ধরনের কষ্ট। অর্থশূন্য কোন বোধ। কাজল চারপাশে তাকায়। এ নিয়ে অনেকবারই তো বদলি হলেন আব্বা। কিন্তু এত কষ্ট কখনো হয়নি। এখানেই না একদিন কাজল কদম বনে বিষ্টি দেখে ভয়ানক বিষণ্ন হয়েছিল? এখানেই জেনেছিল বন্ধুত্ব। জেনেছিল ভালবাসার মিষ্টি শিশির। এখানে দেখেছিলো মৃত্যু ও বিচ্ছেদ। এখানেই।

অনেকে এসেছে স্টেশনে। যারা আব্বাকে ভালবাসতেন, শ্রদ্ধা ও সমীহ করতেন তারা সব। আব্বা জনপ্রিয় মানুষ। যেখানেই যান। এ শহর আবার সেই সত্যকে প্রমাণ করে। কতজনের হাতে হাত মেলালেন তিনি। কতজনের কাঁধে কাঁধ। আষাঢ়ের ঢল নামা বিষ্টি ছিল গতকাল। আজ আকাশ ঝকঝকে। স্টেশনের কৃষ্ণচূড়া লালে লাল। ট্রেনটা প্রায় যখন ছেড়ে দেবে হঠাৎ নিজের নাম শুনে চমকায় কাজল।

পান্না। এসেছে স্টেশনে শেষ দেখা করতে। বলে ও জানালায় দাঁড়িয়ে– বাড়ি ফিরেই এ সংবাদ। আর একটু হলেই ব্যস। ছেড়ে দিত তো ট্রেনটা।

একটি প্যাকেট ওর হাতে। চকলেট। আর অন্য প্যাকেটটি খুলেই চমকে যায় লাল জামা পরা মণিপুরি পুতুল। কালো চুল, নীল চোখ। কাজল সত্যি সত্যিই লজ্জা পেল পুতুল পেয়ে। বলল ও– পুতুল কেন?

রীণু বিনু আর চুমকি চলে যাবার পর পুতুলের বাক্সগুলো অতসির দখলে চলে গেছে এ খবর পান্না কেমন করেই বা জানবে। কেমন করেই বা জানবে এই দুইমাসে কাজল কতটা বড় হয়েছে।

কেন খেলার জন্য। কাজল হেসে বলল– পুতুল খেলা কবেই শেষ।

তা হলে শো-কেসে সাজানোর জন্য।

কাজল তাকিয়ে আছে পান্নার মুখের দিকে। যেন সে দৃষ্টিতে ভালবাসছে। মমতা যাকে বলে আরতি। কাজল ওড়নার আড়ালে তার ধুকপুক হৃদয়টাকে কোথায় যে লুকাবে বুঝতে পারে না। যেন একটা মস্ত কিছু বাকি ছিল। এ দেখাটা না হলে সে ফাঁকির কথা জানা যেত না কোনকালে। সে কেবল একবার পান্নাকে দেখতে চেয়েছিল। দুইমাস ধরে প্রতিদিন।

কাজলের চিবুক ছুঁয়ে পান্না বলে– ভালো থাকিস। চিঠি লিখিস।

কাজলের দু'চোখ অশ্রুতে পরিপূর্ণ। সাধ্য কি ওর তা গোপন করে। মুখ নিচু করে চোখ মুছতে গেলে পাছে হারায় সে মুখ তাই সে তাকিয়েই থাকে। এখন কি কাজল বলবে 'মিঠুপা চিঠিতে আপনাকে শুভেচ্ছা বলেছে। না থাক আজকে ওদের মাঝখানে মিঠুপাকে এনে আর কাজ নেই।

ট্রেন ছাড়বার শেষ হুইসিল। –চোখে কি যে পড়ল বলে কাজলকে ফাঁকি দিতে চাইল পান্না। আর মুখ তুলেই মনে হল এ মুখ কাজলের নয় মিঠুর। এদের দু'বোনের এমন মিল এতদিন সে তো বুঝতেই পারেনি। কিংবা এই মিলটা হঠাৎ ঘটে গেল, না সে খবর আজেই জানা হল, বুঝতে বুঝতেই, সেই আলোছায়া মুহূর্তেই ট্রেনটা আর কারো কথা শুনবে না বলে স্টেশন ছেড়ে ছুটবে বলে ঠিক করে। একটি ছোট শব্দ কিংবা দু'টি– কাজল শোন। এ ডাক কাজল শুনতে পেল না। কাজলের মুখ হারিয়ে গেল, দূর থেকে দূরে সরে গেল। যেমন হারায় অনেক দুর্লভ মুহূর্ত।

পুতুলটাকে বুকে জড়িয়ে জেনে গেল কাজল ছেলেবেলা নামের সেই দুরন্ত খরগোশ ফরিদপুরে রয়ে গেল। যাকে আর কখনো কোনদিন সে খুঁজে পাবে না। আরো জানল একটি বেদনার জন্মরহস্য, একটি অমোঘ সত্য। ভালবাসা ও বিচ্ছেদ, একই দিনে।

● সমাপ্ত

সালেহা চৌধুরী প্রবাসী কথাসাহিত্যিক

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়: মহৎ মানবিকতার রূপকার

মৃদুলা ভট্টাচার্য

প্রবন্ধ

*পথের পাঁচালী*র অমর স্রষ্টা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩০১ বঙ্গাব্দের ২৮ ভাদ্র (১২ সেপ্টেম্বর ১৮৯৪) কাঁচড়াপাড়ার সন্নিকটে ঘোষপাড়া-মুরাতিপুর গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মহানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় কথকতা করতেন। সংস্কৃত পণ্ডিত হিসেবেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে বিভূতিভূষণ ছিলেন সবার বড়। মা মৃণালিনী বড় কষ্ট করে স্বামী-সন্তানদের মুখে দু'মুঠো ভাত তুলে দিতেন। মহানন্দ ছিলেন উদাসীন প্রকৃতির মানুষ। তিনি কথকতার সূত্রে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ঘুরে বেড়াতেন, স্ত্রী মৃণালিনী দেবী সংসার তরণীকে একাই টেনে সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণ করতেন। *পথের পাঁচালী*র হরিহর এবং সর্বজয়া চরিত্রে লেখকের মা-বাবার আদল সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। আশৈশব অভাব-অনটন আর দারিদ্র্যের মধ্যে বড় হলেও বিভূতিভূষণ দারিদ্র্যকে কখনও অভিসম্পাত করেননি, বরং একে পরম সম্পদ বলে গণ্য করে বলেছেন: দুঃখ ছাড়া জীবনে পূর্ণতা আসে না। দুঃখ জীবনের একটা অমূল্য উপকরণ।

এছাড়া বিভূতিভূষণ শৈশব থেকেই গ্রামবাংলার সবুজ, শ্যামল প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে ভালবেসেছিলেন। তাঁর সাহিত্যের অন্যতম উপাদান প্রকৃতি প্রেম। প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর একটা পূর্ণ আর সমগ্র অনুভূতি ছিল। ভাল-মন্দ, সুন্দর-অসুন্দর, আলো-অন্ধকার, রমণীয়তা-ভীষণতা সবকিছু নিয়ে আমাদের মহীয়সী পৃথিবী আর ধরিত্রীমাতার কোলে যে গাছপালা, বন-অরণ্য, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, সমুদ্র আর বনবাসী মানুষ রয়েছে সে সমস্তের প্রতি তাঁর মনে এক সদাজাগ্রত অনুভূতি আর আনন্দ, এক অপরূপ প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টি আর সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়ের ছোঁয়া পাঠক অনুভব করেন। মূলত ঔপন্যাসিক হিসেবে খ্যাতিমান হলেও তাঁর ছোটগল্পে রয়েছে

বিভূতিভূষণের ছোটগল্পের বিরাট অংশ জুড়েই রয়েছে বাংলাদেশের গ্রাম জনপদ আর বাঙালি ঘরোয়া জীবনের চিত্র। এই গ্রাম্য অনাদৃত, অস্পৃশ্য, অনভিজাত ব্রাত্যজনেরা কোনরকম প্রসাধন ছাড়াই ধূলিমলিন পায়ে ওঠে এসেছে তাঁর গল্পে-উপন্যাসে। তাই তারা এত জীবন্ত, অকৃত্রিম, আন্তরিক।

অসাধারণ দক্ষতার স্বাক্ষর। প্রায় দুশো পঁচিশটি গল্প তিনি লিখেছেন। এর সবই যে শিল্পোত্তীর্ণ হয়েছে এমন কথা বলা যাবে না। কিন্তু অসার্থকতার মাপকাঠি দিয়ে কোন শিল্পীকে সমগ্রভাবে বিচার করা অসম্ভব, অনুচিতও বটে। বিভূতিভূষণ সার্থক রসোত্তীর্ণ গল্প অনেক রচনা করেছেন। তাদের সংখ্যা দেড়শোর চেয়ে কিছু বেশি বই কম হবে না। *বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র* গ্রন্থের ভূমিকায় সমালোচক জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী গল্পকার বিভূতিভূষণ সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন: 'বিভূতিভূষণের সমকক্ষ অথবা তাঁর চেয়েও নিপুণতর গদ্যশিল্পী হয়তো বাংলা সাহিত্যে আরও দু'একজন ইতিমধ্যেই আবির্ভূত হয়েছেন এবং ভবিষ্যতেও হবেন, কিন্তু তাঁর পরিণত বয়সে রচিত সর্বশ্রেষ্ঠ পর্যায়ের গল্পগুলোতে তিনি যে জাতীয় রসসমৃদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন ঠিক সেই শ্রেণীর রসসৃষ্টি আর কেউ কখনও করেছেন বলে আমার জানা নেই এবং অদূর ভবিষ্যতে করতে পারবেন এমন আশাও পোষণ করি না।' অর্থাৎ গঠন পরিপাট্য, ঘটনা-বিন্যাস কৌশল, রচনানৈপুণ্য, বর্ণনার বর্ণাঢ্যতা প্রভৃতি বহিরঙ্গঘটিত উৎকর্ষ তাঁর গল্পে যতখানি আছে অন্যান্য গল্পকারের রচনায়ও ততখানি আছে, তার চেয়ে বেশি থাকাও অসম্ভব নয়; কিন্তু জীবন-রূপসৃষ্টিতে এবং জীবন-রস পরিবেশনে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বীহীন, অনন্য। Craftsman হিসেবে, এমনকি বিশুদ্ধ Artist হিসেবেও, তিনি যত বড় রসস্রষ্টা হিসেবে, তার চেয়ে অনেক বেশি বড় রসের রাজ্যের অধিকর্তা হিসেবে; তিনি অতুলনীয়, unique! এই জীবনরসিক বিভূতিভূষণকে পাওয়া যায় তাঁর গল্পে। বিভূতিভূষণ মানুষকে ভালবাসতেন। তাঁর গ্রামের মানুষেরা ছিলেন তার কাছে পরমাত্মীয়ের মত। বিভূতিভূষণের দিনলিপির পাতায়-পাতায় ছড়ান রয়েছে এই ভালবাসার নিদর্শন– 'অনেকদিন পরে গোপালনগরের হাটে গিয়েছি। সেই আশ্বিন মাসের পুজোর ছুটির পর আর আসিনি। সবাই ডাকে, সবাই বসতে বলে। মহেন্দ্র সেকরার দোকান থেকে আরম্ভ করে সবজির গোলা পর্যন্ত। হাটে কত ঘরামী ও চাষী জিজ্ঞেস করে, কবে এলেন বাবু? ওদের সকলকে যে কত ভালভাসি, কত ভালবাসি ওদের এই সরল আত্মীয়তাটুকু। ওদের মুখের মিষ্ট আলাপ। (*উর্মিমুখর*, পৃ. ৩৯) 'কাঁচিকাটা পুল পার হয়ে খানিকটা এসেই একটা লোকের সঙ্গে আলাপ হল। তার বয়স ষাট-বাষট্টি হবে, রঙটা বেজায় কালো, হাতে একটা পোঁটলা, কাঁধে ছাতি। আমি বললাম, কোথায় যাবে হে? সে বললে আজ্ঞে দাদাবাবু, ষাঁড়াপোতা ঠাকুরতলা যাব। বাড়ি শান্তিপুর গোঁসাইপাড়া। লোকটা বললে– একটা বিড়ি খান দাদাবাবু। বেশ লোকটা। ওরকম লোক আমার ভাল লাগে। এমন সব কথা বলে যা সাধারণত শুনিনে।' (প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২) এরকম অজস্র বর্ণনা তাঁর দিনলিপির পাতায় পাওয়া যাবে। কোন কোন সমালোচকের মনে একটা ধারণা গড়ে উঠেছে যে, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহিত্য সৃষ্টি অতি রোম্যান্টিক, বাস্তবতাবিরোধী ও জীবনপলাতক। বিভূতিভূষণের গল্প উপন্যাসের মনস্বী পাঠকমাত্রেই অবহিত আছেন এ অভিযোগের ভিত্তি কত দুর্বল। এই অপবাদের বিরুদ্ধে সমালোচক জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী যে মত দিয়েছেন তাকে যুক্তিসঙ্গত এবং যথার্থ বলে যে কোন নিরপেক্ষ পাঠক মেনে নিতে বাধ্য। তিনি বলেছেন, 'বিভূতিভূষণের রচনায় আর যত কিছু দোষত্রুটিই থাক না কেন, কোথাও বিন্দুমাত্র অস্পষ্টতা নেই। তাঁর বক্তব্য এবং মানসিকতা দুই-ই অত্যন্ত সরল, ঋজু এবং সুস্পষ্ট। কাজেই সত্যিকার অনুসন্ধিৎসু পাঠকের পক্ষে তাঁকে বুঝতে না পারার কোন যুক্তিযুক্ত হেতু নেই।' (*বিভূতিভূষণ গল্পসমগ্র*, ভূমিকা, পৃ. ১) কেউ আবার বিভূতিভূষণের লেখায় সামন্ততান্ত্রিকতা খুঁজে পেয়েছেন। তাদের অভিযোগ বিভূতিভূষণের অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা ব্রাহ্মণ, তথা অভিজাত বর্ণহিন্দু। এ অভিযোগের ভিত্তি যে কত দুর্বল তা তাঁর গল্পগুলি পড়লেই বোঝা যায়। বিভূতিভূষণের গল্পে অন্ত্যজশ্রেণী যেভাবে জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে সমকালীন বাংলা গল্পে তার তুলনা খুব কমই পাওয়া যায়। তাঁর 'অসাধারণ' গল্পের বাগদী মেয়েটি, 'আমার ছাত্র' গল্পের গণেশ মুচি 'বিপদ' গল্পের পতিতা হাজু থেকে শুরু করে অধিকাংশ গল্প জুড়েই রয়েছে দারিদ্র্যক্লিষ্ট গ্রামবাংলার দুঃখী মানুষের যাপিত জীবন। এরা গরিব, দুবেলা পেটপুরে খেতে পায় না, অথচ হৃদয়-ঐশ্বর্যে এরা মহৎ, পরকে আপন করতে এদের জুড়ি নেই। বস্তুতপক্ষে বিভূতিভূষণের ছোটগল্পের বিরাট অংশ জুড়েই রয়েছে বাংলাদেশের গ্রাম জনপদ আর বাঙালি ঘরোয়া জীবনের চিত্র। এই গ্রাম্য অনাদৃত, অস্পৃশ্য, অনভিজাত ব্রাত্যজনেরা কোনরকম প্রসাধন ছাড়াই ধূলিমলিন পায়ে ওঠে এসেছে তাঁর গল্পে-উপন্যাসে। তাই তারা এত জীবন্ত, অকৃত্রিম, আন্তরিক। এরকম অজস্র গল্পের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় 'আহ্বান, 'ফকির', 'আমার ছাত্র', 'রূপো-বাঙলা', 'বারিক অপেরা পার্টি'র নাম।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিভূতিভূষণ তাঁর গ্রামের লোকজনের সঙ্গে খুব আন্তরিকভাবে মিশতেন, তারাও কখনো তাঁকে পর মনে করেনি। এমনি একজন জমির করাতীর স্ত্রী। 'আহ্বান' গল্পে জমির করাতীর স্ত্রীর চেহারার বর্ণনা লেখক এভাবে দিয়েছেন: আমগাছের ছায়ায় একটি বৃদ্ধার চেহারা ভারতচন্দ্র বর্ণিত জরতীবেশিনী অন্নপূর্ণার মত, কোন তফাৎ নেই, ডান হাতে নড়ি ঠুক ঠুক করতে করতে বোধ হয় বা বাজারের দিকে চলেছে। এ ধরনের বুড়িকে দেখে আমার বড় মায়া হয়– নারী রূপের এ এক অপূর্ব পরিণতি। এই জমির করাতীর বউকে তিনি অমর করে রেখেছেন 'আহ্বান' গল্পে। বিভূতিভূষণের গল্প সংগ্রহের মধ্যে তো বটেই, সমগ্র বাংলাসাহিত্যে 'আহ্বান'-এর মত গল্প খুব বেশি লেখা হয়নি। হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের এক অপরূপ ভাষা এ গল্প। সহজ-সরল আখ্যানভাগ সংবলিত এ গল্পের অসাধারণত্ব এর অন্তর্নিহিত মানবিক রস। বিভূতিভূষণের অনেক গল্পের মত এ গল্পেরও বাস্তব ভিত্তি রয়েছে। দুঃখী, অসহায়, বৃদ্ধা যার তিনকূলে কেউ নেই এক নাতনী ছাড়া। তাও নাতজামাই বুড়িকে খেতে-পরতে দেয় না। বুড়ি কোনরকমে দিন আনে দিন খায় করে চালায়। তবু এককালে সে সম্পন্ন গৃহস্থের স্ত্রী ছিল– একথা কিছুতেই ভুলতে পারে না বলে গল্প লেখকের জন্যে প্রায়ই সে হাতে করে এটা ওটা নিয়ে আসে। এই স্নেহের দান গ্রহণ করতে প্রায়ই কুণ্ঠিত হয়ে পড়েন লেখক। কারণ গ্রামে নানারকম লোকজন উপরন্তু লেখক ব্রাহ্মণবংশীয় সন্তান, বুড়ি মুসলমান, মাঝে মাঝে কঠোর ব্যবহার করে লেখকের মন অনুতাপে ভরে উঠেছে। বুড়ি কিন্তু এ অবহেলা গায়ে মাখে না আদৌ। প্রতিদিন সকাল হতে না হতেই সে এসে জুটবে। 'অ গোপাল, এই দুটো কচি শসার জালি মোর গাছের– এই ন্যাও। নুন দিয়ে খাও দিনি মোর সামনে।' বৃদ্ধার স্নেহের সম্বোধনে মাতৃস্নেহ শতধারে উৎসারিত। বৃদ্ধা অসুস্থ হয়ে পড়লে লেখক তাকে দেখতে গেলে বুড়ি আবদার করে বলেছিল: 'গোপাল, যদি মরি, আমার কাফনের কাপড় তুই কিনে দিস। পাশের লোককে জিজ্ঞেস করলাম– সে কি? জানেন না বাবু, মাটি দেবার সময় নতুন কাপড় কিনে পরিয়ে দিতে হয়।' সে যাত্রা কিন্তু বুড়ি সেরে উঠল, লেখক নানা ব্যস্ততায় নিজেকে জড়িয়ে ফেললেন। বহুদিন পর দেশের মাটিতে পা দিয়েই শুনলেন বুড়ির মৃত্যু সংবাদ। গল্প থেকেই উদ্ধৃত করা যাক: 'আমি এসেছি শুনে বুড়ির নাতজামাই দেখা করতে এল– বাবু এসেছেন? সাহায্য করুন, কাফনের

তাঁর গল্পে শাশ্বত মানুষের মেলা যে মানুষ মঙ্গলকামী, কল্যাণকামী, যাবতীয় শুভ চিন্তার ধারক, উপাসক। শতবর্ষ সোপান পেরিয়ে এসেও বিভূতিভূষণ বাংলার হারিয়ে যাওয়া সমস্ত মূল্যবোধের প্রতীক হয়ে ওঠেন। তাঁর দেখা গ্রামবাংলার দুঃখ-দুর্দশা দারিদ্র্য হাহাকার কিছুই অবলুপ্ত হয়ে যায়নি।

কাপড় কিনতে। যা দাম কাপড়-চোপড়ের। আমার মনে পড়ল বুড়ি বলেছিল সেই একদিন আমি মরে গেলে তুই কাফনের কাপড় কিনে দিস বাবা, ওর স্নেহাতুর আত্মা বহুদূর বারানসী থেকে আমায় কিভাবে আহ্বান করে এনেছে। আমার মন হয়ত ওর ডাক এবার আর তাচ্ছিল্য করতে পারেনি।' এ প্রসঙ্গে বিভূতিভূষণ তার উৎকর্ণ দিনলিপিতে লিখেছেন: কিন্তু সকলের চেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা, বুড়ি মারা গেল, আমি তখন ওখানে। তার কবর দেয়ার সময় আমি কতক্ষণ আমতলায় বসে কালু মুসলমানের সঙ্গে গল্প করলাম। হুবহু এই চিত্র 'আহ্বান' গল্পের শেষাংশে বরং গল্পে যেন আরো অপরূপ মমতাসিক্ত হয়ে উঠেছে:

'শরতের কটুতিক্ত গন্ধ ওঠা বনঝোপ ও মাকাললতা দোলান একটি প্রাচীন তিত্তিরাজ গাছের তলায় বৃদ্ধাকে করব দেওয়া হচ্ছে।

আবদুল, শুকুর মিঞা, নসর, আমাদের সঙ্গে পড়ত আবেদালি, তার ছেলে গনি– এরা সকলে গাছের ছায়ায় বসে। প্রবীণ শুকুর মিঞা আমাকে দেখে বলল– এই যে বাবা ঠাকুর, এস। তোমায় যে বড্ড ভালবাসত বুড়ি। তোমার কাছে কাফনের কাপড় নিয়ে তবে ওর মহাপ্রাণীডা ঠাণ্ডা হল। করব দেওয়ার পরে সকলে এক এক কোদাল মাটি দিলে কবরের ওপর। শুকুর মিঞা বললে, দ্যাও বাবাঠাকুর, তুমিও দাও, তুমি দিলে মহাপ্রাণী ঠাণ্ডা হবে।

দিলাম এক কোদাল মাটি। সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, ও বেঁচে থাকলে বলে উঠত, অ মোর গোপাল।'

কোথা থেকে কোথায় চলে গেল গল্পটি। এই নিঃস্বার্থ স্নেহ-বাৎসল্য দেশকাল জাতি ধর্ম-বর্ণের ঊর্ধ্বে। গল্পের শেষে জমির করাতীর স্ত্রী তাই হয়ে ওঠে শাশ্বত মাতৃরূপের প্রতীক। ঈশ্বর, প্রকৃতি এবং মানুষ এই ত্রিবিধ উপাদান নিয়ে বিভূতিভূষণের সাহিত্যজগৎ। কিন্তু ছোটগল্পে দেখা যায়, শুধু মানুষের ভিড়। 'ফকির' গল্পেও দেখি সাধারণ মানুষের ছবি। ইচু ফকির সামান্য দিনমজুর। সমস্ত দিন তার খাটাখাটুনি করে যায়। ইচু তার সৎ স্বভাবের গুণে গ্রামবাসীর মন জয় করেছে। স্ত্রী নিমির অস্বাভাবিক মৃত্যুর পর ইচু জানাল সে ছিল দুশ্চরিত্রা, ভ্রষ্টা প্রকৃতির। অথচ ইচু তাকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে। ইচু অল্পে সন্তুষ্ট, কারো কাছে হাত পাততে নারাজ। স্ত্রীর মৃত্যুর পর যখন থানা থেকে দারোগা-পুলিশ এল, ইচু নির্বিকার। সবাই যখন ইচুকে নিয়ে উকিলের কাছে গেল– উকিল সন্দেহ করেছিলেন হয়তো ইচু এ হত্যাকাণ্ডের সাথে কোন না কোনভাবে জড়িত। কিন্তু যখন ইচু উকিলবাবুর কাছে প্রার্থনা করল, বাবু যেখানে মোরে রাখে, ঝা করে ক্ষেতি নেই। কিন্তু বাবু, আপনি এইটে তাদের বলে দেবেন, ব্যবস্থা করে জেন পাঁচওক্ত নামাজ আমি সেখানে পড়তি পারি– আর কিছু আমার বলবার নেই, বাবু।'

তখন উকিল রামলালবাবু স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। বিভূতিভূষণ তার বর্ণণা করেছন: 'ঘুঘু মোক্তার রামলাল চাটুজ্যে হাঁ করে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। এরকম কথা এ সময় তিনি সামান্য একজন গ্রাম্য লোকের মুখ থেকে আশা করেননি। ইচু নির্দোষ প্রমাণিত হবার পর সংসার ছেড়ে গেল।' গল্পের শেষ করেছেন লেখক এভাবে– 'খলসেখালি গ্রামের প্রান্তে নদীতীরে তেঁতুলগাছের তলায় পর্ণ কুটিরে একজন ফকির কোথা থেকে এসেছে। সন্ধ্যায় আকাশের নীলপটে মেঘের রচনার সঙ্গে সঙ্গে সে খেজুর চাটাই বিছিয়ে নদীর ধারে যখন নামাজ পড়ে তখন লোকে সবিস্ময়ে তার মুখে দেখেছে এক অদ্ভুত আলো। প্রভাতী তারার মৃদু জ্যোৎস্নার মত। এক সন্ধ্যা ভিক্ষাই তার উপজীবিকা, সবাই ওকে মানে, ভক্তি করে। নাম ওর ইচু ফকির। গ্রামের অশিক্ষিত সাধারণ দিনমজুর এই অসামান্য সাধুতা আর ধর্মবিশ্বাসে অসাধারণ হয়ে উঠেছে।'

'রূপো-বাঙলা' গল্পেও পাই এমনি এক চরিত্র যে আপনার জীবন দিয়ে রক্ষা করেছে প্রভুর বিষয়-সম্পত্তি। 'আমার ছাত্র' গল্পের গণেশ মুচিও বিভূতিভূষণের স্বগ্রামের এক বাস্তব চরিত্র। দিনলিপিতে বিভূতিভূষণ গণেশকে বর্ণনা করেছেন, নিরীহ, সাধু, সরল প্রকৃতির মানুষ বলে। মূর্খ গণেশ মুচিকে শিক্ষিত করে তোলার পুরো দায়িত্ব নিয়েছিলেন বিভূতিভূষণ। এই কঠিন কর্ম সম্ভব হয়েছিল গণেশেরই ঐকান্তিক আগ্রহ এবং নিষ্ঠার কারণে। লেখকের চেষ্টায় সীমিত কয়েকটি ইংরেজি শব্দ শিখে গণেশ দাদা মহাখুশি। সরল, সাধারণ চাষী গণেশ মুচির সঙ্গে বহুদিন পর লেখকের দেখা হলে লেখক দেখেন গণেশ বৃদ্ধ হয়ে গেছে, সামান্য কুঁজোও। তবু তার শিক্ষাগ্রহণের স্পৃহা এতটুকুও কমেনি। লেখককে দেখে তার সে-স্পৃহা বেড়ে যায়। গল্পে বর্ণনায় দেখা যায়, হ্যাদে দাদাঠাকুর একটু শুধোও দিকি?

– কি?

– সেই ইনজিরি। মুই মুখস্থ বলব? ওভার মানে ওপর। ওয়াটার মানে জল, বাড মানে পাখি, বালির ইনজিরি স্যান্ড, মাছের ইনজিরি ফ্লাই–

– উহু

– মাছের ইনজিরি ফ্ল্যাই নয়?

আর এক ডজন ইংরেজি শব্দ বসে বসে আমার জ্ঞানপিপাসু শুভ্রকেশ ছাত্রকে শিক্ষা দিলাম সেই কাশফুল ফোটা চরে বসে শরতের অপরাহ্নে।'

গল্পটি শেষ করেছেন বিভূতিভূষণ এভাবে 'কি বৈষয়িক উন্নতির দিক থেকে, কি ইংরেজি শিক্ষার দিক থেকে গণেশ দাদা সারাজীবন প্রথম সোপানেই রয়ে গেল বটে, কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওর মধ্যে এমন কিছু ছিল যার সাহায্যে ও সব সোপান অতিক্রম করে আমাদের অনেককে অতিক্রম করে অনেক উঁচুতে পৌঁছেছিল।' মানুষের ভিতরকার অবিনাশী, শাশ্বত গুণাবলীর সন্ধান করেছেন বিভূতিভূষণ। মহৎ মানুষ হতে হলে মানবিকতায় উদ্বুদ্ধ হতে হয় তার জন্যে কোন কৃত্রিম সাধনা বা শিক্ষার প্রয়োজন হয় না। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বিভূতিভূষণের মূল্যায়ন করতে গিয়ে বলেছেন– 'বিভূতিভূষণের লেখায়, কথায়– বুঝিয়ে বলা যায় না এমন একটা জিনিস আছে যা আমাদের মনের গভীরে গিয়ে পৌঁছায়, আমাদের জাগিয়ে তোলে, আর আমাদের মনের অবচেতনায় আদিম যুগ থেকে যে প্রকৃতির সঙ্গে সাযুজ্যের একটা অব্যক্ত আকাঙ্ক্ষা আছে, সেইটি জিইয়ে তোলে। বিভূতিভূষণ নিজেও বিশ্বাস করতেন মানুষের ব্যথাহত আত্মার আকুতি– সেটাই আসল জিনিস। তিনি বিশ্বাস করতেন, it is the prayer, the music, the song of the human soul, শুধু teller of tales হওয়া তাঁর কাছে মুখ্য ছিল না। মানুষের প্রাণের কথা ফুটিয়ে তুলতে হবে ব্যঞ্জনা দিয়ে, অনুভূতি দিয়ে, হৃদয় দিয়ে।' তাই তো, তাঁর গল্পে শাশ্বত মানুষের মেলা যে মানুষ মঙ্গলকামী, কল্যাণকামী, যাবতীয় শুভ চিন্তার ধারক, উপাসক। শতবর্ষ সোপান পেরিয়ে এসেও বিভূতিভূষণ বাংলার হারিয়ে যাওয়া সমস্ত মূল্যবোধের প্রতীক হয়ে ওঠেন। তাঁর দেখা গ্রামবাংলার দুঃখ-দুর্দশা দারিদ্র্য হাহাকার কিছুই অবলুপ্ত হয়ে যায়নি। *পথের পাঁচালী*র অপু-দুর্গার মত শত শিশু এখনো গুড়কেই সবচেয়ে মিষ্টি বলে জানে। বিভূতিভূষণ এখনো তাঁর প্রাসঙ্গিকতা হারাননি। শাশ্বত বাঙালির হারানো মূল্যবোধ ফিরে পাবার জন্যেই আমাদের বার-বার তাঁর কাছে ফিরে যেতে হবে।

মৃদুলা ভট্টাচার্য শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক

ছোটগল্প

তাদু নক্ষত্র

অনিন্দিতা গোস্বামী

ছাদের ঠিক মাঝখানে মাদুর পেতে চিৎ হয়ে শুয়ে ছিলাম আমি, মাথার নীচে হাত দুটো দিয়ে রেখেছিলাম বালিশের মত, এটা আমার খুব প্রিয় ভঙ্গী। এভাবে আকাশ দেখতে আমার খুব ভাল লাগে। এই তো দিব্যি বোঝা যায় আকাশটা ঢালু হয়ে নেমে এসেছে উল্টোনো বাটির মত, তার মানে পৃথিবীটা গোল। কই এটা বুঝতে তো আমাকে বড় মাঠ কিংবা কোন দিগন্তের দিকে তাকাতে হয়নি। কি জানি হয়তো আগে থেকে জানি বলেই দুই-এ দুই-এ মিলিয়ে নিয়েছি। মানুষের স্বভাবই তো এই, যা জানা থাকে তার বাইরে বেরোতে চায় না।

আজকাল ছাদে আর আসাই হয় না। অপিস থেকে ফিরতেই সন্ধ্যে, তারপর ঘর-সংসারের টুকিটাকি, ছেলেকে পড়ানো, তাছাড়া এসির ঠাণ্ডা, গদির আরাম ছেড়ে খামোখা আমি ছাদে আসতেই বা যাব কেন। সে ছিল আমাদের ছোটবেলায়। লোডশেডিং হলেই হেরিকেন নিয়ে আমরা উঠে যেতাম ছাদে। চারিদিকে অন্ধকার– তারমধ্যে ছোট্ট হলুদ গোল আলোয় বই পেতে পড়া, ওফ্ সে খুব মজার। কেমন একটা ভয় ভয় করত, নারকেল গাছের পাতাগুলো দুলত শনশন করে। কিছুক্ষণ পড়ার পরেই আমরা দুই বোন শুয়ে পড়তাম মাদুরে। বোন বলত আমাকে, ঐ দেখ দিদি কেমন মেঘের হাতি শুঁড় তুলে আছে। আমি বলতাম আর ঐ দেখ কেমন রাজবাড়ি, মেঘের ছবি বানাতে আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়তাম দুজনেই। বাবা অপিস থেকে ফিরলে চিঁড়ে ভাজা আর চা নিয়ে গুটিগুটি উঠে আসত ছাদে, পিছন পিছন মা-ও। তারপর মা আর বাবাও যোগ দিত আমাদের ছবি বানানোর খেলায়।

বাবা এটা-ওটা দেখানোর পর প্রতিদিনই প্রায় বলত, দেখেছিস ঐ দেখ কেমন গান্ধীজী! মা অমনি, মুখ টিপে বলত, আর ঐ দেখ কেমন কার্ল মার্কস্ । আসলে বাবা সব কিছুইতেই গান্ধীজীকে এনে ফেলত। আমরা গান্ধীজী, মার্কস্ কিছুই খুঁজে পেতাম না কিন্তু মায়ের টিপ্পনীটুকু বুঝে খুক্ খুক্ করে হাসতাম।

এখন শহরে বিশেষ লোডশেডিং হয় না। কি একটা কারণে দু'দিন ধরে সন্ধ্যেবেলায় আলো চলে যাচ্ছে। ইনভার্টারটাও আমার খারাপ হয়েছে হঠাৎ। একটা ব্যাটারির আলোয় ছেলে পড়ছে নীচে। আমার বর ঠিক করেছে ক্লাবেই কাটিয়ে আসবে সন্ধ্যেটা। আর আমি মাদুর নিয়ে চলে এসেছি ছাদে। আজ আকাশটা ধূসর রঙের মেঘে ঢাকা। ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘের মাঝখান দিয়ে যখন চকচকে রূপোলি চাঁদটা পেরিয়ে যাচ্ছে– ঝক্ ঝক্ করছে এক টুকরো নীল আকাশ, যেন বোরখার ফাঁক দিয়ে দেখা দু'খানি চোখ। বোরখার বিরুদ্ধে লোকে যতই কথা বলুক না কেন আমার কিন্তু বেশ লাগে ব্যাপারটা, কেমন সবার থেকে আড়াল করে রাখা যায় নিজেকে। কথাই তো আছে, আপনা মাসে হরিণা বৈরী! শুধু ঐ বহিরঙ্গের রূপটুকুর জন্যই তো মেয়েরা মেধা, মনন, কোন গুণেরই স্বীকৃতি পেল না সেভাবে।

এতসব ভারী ভারী চিন্তা কিন্তু ছোটবেলায় আমার মাথাতেই ছিল না। মনে হত বোরখার মত প্রয়োজনীয় জিনিস আর নেই।

বিশেষ করে অরিত্রর সঙ্গে যখন প্রেম করতাম, আমাদের সময়টা ছিল এমন যে প্রেম মানে শুধু পার্কে বসে দুটো গল্প করা কিংবা বড়জোর এক ঠোঙা চিনেবাদাম খাওয়া, তাও পাড়ার দুধওয়ালাকে দেখলেই হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যেত আমাদের। মৌচাক সিনেমাটায় মুখোশের আড়ালে প্রেমটা বেশ মনে ধরে ছিল কিন্তু আশেপাশে খোঁজ করে মুখোশ কোথাও পাইনি, বরং পাশ দিয়ে যখন বোরখা পরা মেয়েগুলো চলে যেত ভাবতাম, ইস্ ওদের কি মজা কেউ চিনতে পারে না। আমার বোন বলত, এত ভয় কিসের রে তোর দিদি, আমি যখন প্রেম করব তখন তো তার কনুই ধরে গাইতে গাইতে রাস্তা দিয়ে হাঁটব, বেশ করেছি প্রেম করেছি করবই তো।

আমি বলতাম, হু! আর বাবা জানতে পারলে রক্ষা রাখবে?

বোন ঘাড় তুলে বলত, কি করবে? মারবে? মারুক। কতক্ষণ মারবে যতক্ষণ বেঁচে থাকব ততক্ষণ তো।

আমি অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে থাকতাম। কি অসম্ভব জেদ ছিল ওর। এই বোনটা আমার বিষ খেয়েছিল। ওর যখন একুশ বছর বয়স, বরাবরের ফার্স্ট হওয়া মেয়ে ভাদু এম এসসিতে খুব খারাপ রেজাল্ট করেছিল। সবাই জানত তাই, কিন্তু আমি জানি ব্যাপারটা ছিল অন্য, কারণটা ছিল একটা খয়েরী বোরখা, যেটা একদিন পরতে বাধ্য হয়েছিল ও।

হ্যাঁ, আমার বোনের নাম ছিল ভাদু আর আমার ছিল টুসু। ভাদু চলে যাবার পরে ও নাম ধরে, আমাকে আর বিশেষ কেউ ডাকে না। আমিই ডাকতে দিই না। অনন্যা নামটিই এখন সর্বত্র প্রচলিত। আমার বাবা ছিল ভূমি রাজস্ব দপ্তরের আধিকারিক, প্রথম জীবনে ওঁর পোস্টিং ছিল পুরুলিয়ায়। তখনই আমাদের দুই বোনের নাম রাখে টুসু আর ভাদু। আশ্চর্য বোনের এই নামের সঙ্গে লোকগাথার ভাদুর জীবনপ্রবাহ এমনভাবে মিলে যাবে এ কথা কেউ স্বপ্নেও ভাবেনি। সে ভাদুও তো স্বামীর প্রতীক্ষায় থেকে থেকে আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছিল।

বোন তখন এম এসসি পড়ে। বাবার কঠিন একটা স্নায়ুরোগ ধরা পড়ল। আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা করাতে বাবাকে নিয়ে যেতে হল কেরালায়। মাসের পর মাস থাকতে হবে সেখানে। সঙ্গে গেল মাও। বোনের তখন পরীক্ষা। কি করে থাকবে সে একা বাড়িতে। ওকে আমার বাড়িতে রেখে যাওয়াই মনস্থ করল মা-বাবা। আমার বাচ্চাটা তখন সদ্য উপুড় হতে শিখেছে, এইমাস চারেক হবে। বোন এসে থাকাতে অর্ধেক ঝক্কি যেন হালকা হয়ে গিয়েছিল আমার। স্টাডি লিভের তিন মাস তো বাঁধা আয়াও রাখতে দেয়নি আমায়। বলেছিল, তোর মেয়েতো সারা দুপুর ঘুমোয়, শুধু শুধু পয়সা খরচ করে আয়া রাখবি কেন? একটা লোক রাখ, কাঁথা-কাপড় ধুয়ে দিয়ে যাবে। বাকি কাজ দিব্যি সামলে নিতে পারব আমি, আরে মাসি মানে তো মা-ই।

দক্ষিণ দিকের ছোট্ট ঘরটায় আত্মহত্যা করেছিল ও। ফলিডল খেয়েছিল। পিঁপড়ে মারার জন্য ফলিডল এনেছিলাম। লাল বড় বড় মাজালি পিঁপড়ে, আমার বাচ্চাটাকে কামড়ালে নীল হয়ে যেত। রাস্তার পাশে অর্জুন গাছ থেকে কেবলের তার বেয়ে ঘরে ঢুকত পিঁপড়েগুলো। কিছুতেই মরত না, কেরোসিন তেল, বেগন স্প্রে, গ্যামাক্সিন সব চেষ্টা করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত মা-ই বলেছিল ফলিডল দিয়ে দেখ। হ্যাঁ কাজ হয়েছিল। জানালার ওপরে ছিটিয়ে দিয়ে দেখেছি পিঁপড়েগুলো কেমন ছটফট করে মরে। একটা পিঁপড়ে হত্যার পাপও বোধহয় জীবনে কাউকে ছাড়ে না।

ঘটনাটা আমি বুঝতে পেরেছিলাম অনেক পরে। ভুরু কুঁচকে ডেকেছিলাম, ভাদু। ভাদু মন্থর গতিতে এসে দাঁড়িয়েছিল সামনে। চিৎকার করে উঠেছিলাম আমি, আমাকে বলিসনি কেন এত দিন।

ও জবাব দিয়েছিল, জানলেই তো মেরে ফেলতিস, তাই।

আমি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছিলাম খাটে। বলেছিলাম, আমি কি করে মা-বাবার কাছে মুখ দেখাব! কে ঘটাল এমন কাণ্ড? ও আমার পায়ের কাছে মেঝেতে বসে পড়ে বলেছিল, সব বলব, শুধু তুই বল একে মারবি না। না হয় তুই-ই মানুষ করলি। মাসি মানে তো মা-ই।

আমার ভেতর পর্যন্ত কেঁপে উঠেছিল, ধড়ফড় করে উঠছিল বুক, ফ্যাসফেসে গলায় আমি বলেছিলাম, কার না কার পাপ আমি মানুষ করব! ওসব আমি কিছুতেই পারব না। তাছাড়া তোরও তো ভবিষ্যৎ পড়ে আছে, এসব কথা কি চাপা থাকে। যত শিগ্রি সম্ভব আমি সব ব্যবস্থা করছি, ভয় পাস না। গর্ভপাত এখন কোন ব্যাপারই না। হ্যাঁ তুই যদি এখন তাকে বিয়ে করতে চাস সে কথা আলাদা। আগে তো আমাকে জানতে হবে কে এই কাণ্ড ঘটিয়েছে? ভাদু বলল, বাচ্চাটাকে যখন রাখবিই না তখন জেনে আর কি করবি এর বাবা কে? হয়তো সে আর এই পৃথিবীতেই নেই, হয়তো সে আর এই দেশেই নেই কিংবা হয়তো সে এখানেই আছে।

মানে তুই বলবি না কে?

না, যদি তুই কথা দিস বাচ্চাটাকে মানুষ করবি তবে বলতে পারি।

তুই কি আমার ভরসায় ওকে পৃথিবীতে এনেছিলি?

কেন তুই তোর মেয়েকে আমার ভরসায় রেখে অপিস করিস না?

সেটা আর এটা এক হল?

তুই ভেবে দেখ সবটাই এক। বাচ্চাটাকে মেরে ফেললে তুই খুশি হোস?

হ্যাঁ।

বেশ যাব। তুই যা বলবি তাই করব।

অরিত্রকে আমার বিয়ে করা হয়নি। বিয়ে করেছিলাম বাবার পছন্দ করা ছেলেকেই। আমার বরও অবশ্য নিতান্ত ভালমানুষ টাইপের। ভাদুর সঙ্গে সখ্যও ছিল খুব। আমি ওকে বললাম, কি করি বল তো? ও বলল ভাদু যখন চাইছে না, ক্ষতি কি, আমরা না হয় আর একটা বাচ্চা মানুষই করলাম। আমি যেন আরো ব্যস্ত হয়ে উঠলাম ভাদুর বাচ্চাটা মেরে ফেলার জন্য। একটা সন্দেহের কাঁটা এফোঁড় ওফোঁড় করছিল আমাকে। আমি মনে করার চেষ্টা করছিলাম, কোনদিন কি আমার বর আমার না-থাকা সময়ে তাড়াতাড়ি অপিস থেকে বাড়ি ফিরে এসেছে? কোনদিন কি ওদের একা বাড়িতে রেখে আমি অপিস চলে গিয়েছি? আমার স্মৃতি আমাকে সাহায্য করছিল না, সব তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছিল। ভাদু কেন ছেলেটার নাম বলছে না।

আমি একটা খয়েরী বোরখা বড়বাজার থেকে কিনে এনে ছুঁড়ে মেরেছিলাম ভাদুর মুখের ওপরে। বলেছিলাম, পরে নে। নার্সিং হোমে আমি সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলাম। বাড়ি ফিরে এসে আমি বোরখাটা মাটির নীচে পুঁতে দিয়েছিলাম। সেদিন রাতেই বিষ খেয়েছিল ভাদু। একটা ছোট চিরকুটে লিখে রেখে গিয়েছিল, তুমি বাচ্চাটাকে বাঁচতে দিলে না, আমাকেও না। আমি তাই কিছুতেই লোকটার নাম বলব না, যাতে তুমি প্রতিদিন দগ্ধে দগ্ধে মর একটু একটু করে। এটাই তোমার শাস্তি।

বাড়িটায় আর আমরা থাকিনি। বেচে দিয়েছিলাম জলের দরে। অপমৃত্যুর ছাপলাগা বাড়ির ভাল দাম পাওয়া যায় না। বাড়ি মানেই মানুষের কাছে একটা শুভ জিনিস। প্রত্যেকেই যখন বাড়ি কেনে ভাবে সে বাড়িতে শুধু হাসি গান আর আনন্দ থাকবে। আমার বর শান্তশিষ্ট হলেও বেশ কাজের মানুষ, ওসব চিরকুট ফুট্ দিয়ে যাতে কোন গোলযোগ না পাকে তার ব্যবস্থা করে ফেলেছিল। ভাদু মরে যাবার পর অবশ্য আমার বরের সঙ্গে আমার তুমুল ঝগড়া বেধেছিল। ভাদু বেঁচে থাকতে যে সন্দেহের কথা আমি মুখ ফুটে বলতে পারিনি সেকথা পরে আমি চিৎকার করে বলেছি আমার বরকে। ও বলেছে তুমি পাগল হয়ে গেছ? ছি ছি তুমি এমন কথা ভাবতে পারলে? তাতেও আমার বিন্দুমাত্র বিশ্বাস হয়নি সে কথা। সত্যি কথা বলতে কি সেই থেকে আমাদের সম্পর্কটাই চিড় খেয়ে গিয়েছিল।

থাকতাম না ওর সঙ্গে আমি কিন্তু আমরা নতুন যে ফ্ল্যাটটা কিনেছি সেটা অপূর্ব সুন্দর একটা বহুতলে একেবারে উপরের দিকে। এটার দাম এত বেশি যে আমাদের দু'জনকে মিলে লোনটা নিতে হয়েছে। এই ফ্ল্যাটের দক্ষিণের ব্যালকনিতে দাঁড়ালে মনে হয় আকাশে উড়িয়ে নিয়ে যাবে হাওয়া, হাত বাড়ালেই বুঝি ছোঁয়া যাবে তারাদের। এই লোন শোধ করতে সারা জীবন লেগে যাবে আমাদের, কি করে আর ছেড়ে যাব ওকে!

সেই ফ্ল্যাটের ছাদে আজ শুয়ে আছি আমি। হাওয়া উঠেছে। মেঘগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে গিয়ে তৈরি করছে অবয়ব। পিঁপড়ের সারি, ফণা তোলা সাপ, কুমির। আমার দেখতে ইচ্ছে করছিল না ঐ মেঘছবি। আমি চোখ বন্ধ করে ফেললাম, আমার চোখের কোনা দিয়ে গড়িয়ে নামছিল জল আর ঠিক তক্ষুনি আমার কপালের মাঝখানে টপ করে ঝরে পড়ল একফোঁটা বৃষ্টি, ভাদু নক্ষত্রের জল বুঝি-বা।

অনিন্দিতা গোস্বামী
ভারতের কথাসাহিত্যিক

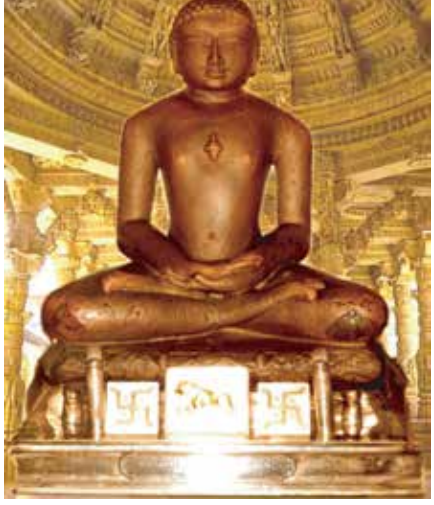

বর্ধমান মহাবীর

জৈন ধর্মের অন্যতম ধর্মগুরু মহাবীরের জন্ম ৫৯৯ খ্রি.পূর্বাব্দে চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে বিহারের পাটনার সন্নিকটবর্তী বেসধাপত্তির কুন্দ গ্রামে। গ্রামটি অধুনা বৈশালী জেলার হাজীপুরে অবস্থিত। তাঁর পিতা রাজা সিদ্ধার্থ, মাতা ত্রিশালা। তিনি যখন মাতৃগর্ভে, তাঁর মা অনেক শুভস্বপ্ন দেখেছিলেন। তখন গোটা রাজ্যে শুভলক্ষণের ছড়াছড়ি– গাছে গাছে ফুল-ফল, মাঠে মাঠে ফসলের বিপুল সম্ভার। সব কিছুই তখন ক্রমবর্ধমান, একারণে জন্মের পর তাঁর নাম রাখা হয় বর্ধমান।

রাজকুমার বর্ধমান শৈশব থেকেই ছিলেন ধর্মপ্রাণ। জৈন ধর্মের নিগূঢ় বিশ্বাসে তিনি ধ্যান ও নানা আত্মনিগ্রহে নিয়োজিত থাকতেন এবং জাগতিক ভোগবিলাস বর্জন করেন।

ত্রিশ বছর বয়সে যুবরাজ বর্ধমান রাজ্য-সংসার ও যাবতীয় পার্থিব সম্পদ পরিত্যাগ করে দীর্ঘ বারো বছর তপশ্চর্যায় নিমগ্ন হন। তাঁর অধিকাংশ সময় কাটত ধ্যানানুশীলনে। তিনি মানুষ-পশুপাখি-গাছপালা সর্বজীবেই শ্রদ্ধাপোষণ করতেন, কারুর ক্ষতি করতেন না। যাবতীয় পার্থিব সম্পদ এমন কি পরিধেয় পর্যন্ত বিসর্জন দিয়ে কঠোর আত্মসংযম ও তপশ্চর্যার জন্য তিনি মহাবীর নামে খ্যাত হন। আহার-নিদ্রা সম্পর্কে তিনি এতটাই উদাসীন ছিলেন যে তপশ্চর্যার সাড়ে বারো বছরে তিনি মাত্র তিন ঘণ্টা ঘুমিয়েছিলেন। এসময় তিনি কোন আশ্রয়ের সন্ধান করেননি, শীতে আগুন জ্বালেননি কি নিজেকে বস্ত্রাবৃত করেননি। তাঁর কাছে শীত-গ্রীষ্ম ছিল সমান। সামনে এক-মানুষসমান দূরত্বে একটি বর্গাকার বিন্দুর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করে তিনি ধ্যানে বসতেন। এসময় আশেপাশে কি ঘটল, পাপ-পুণ্য, লোভ-লালসা, শব্দ-বর্ণ কিছুই তাকে স্পর্শ করতে পারত না। এই দীর্ঘ সময় তিনি থেকেছেন ধীরস্থির, অবিচলিত। এসময় তিনি কথা বলেছেন সামান্যই।

এসময় তিনি ক্ষিতি-অপ-তেজ-মরুৎ-ব্যোম– এই পঞ্চভূতের রহস্য অনুধাবনে সমর্থ হন। এসময় তিনি অপরের বস্ত্র পরিধান করেননি, অপরের পাত্রে পান-ভোজন করেননি, চোখ কচলাননি, এমন কি শরীর চুলকাননি পর্যন্ত। এসময় যখন যা পেয়েছেন তা-ই খেয়েছেন– বাসি-পচা-ঠাণ্ডা খাবার, জাউ, শিমের বিচি। ক্ষুধার্ত পশু-পাখি-ভিক্ষুকের সামনে পড়লে তিনি ভিক্ষা মাগেননি। তিনি উপবাসী থাকতেন– হয়তো ছয়দিন, আটদিন, দশদিন বা বারোদিনে একবার মাত্র খেলেন, হয়তো পনেরোদিন, একমাস, দুইমাস বা ছয়মাসে একবার মাত্র জলপান করলেন। বৃষ্টির চারমাস ছাড়া পুরো বছরই তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে পদব্রজে দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন। এসময় তিনি গ্রামে যদি এক রাত কাটান তো শহরে কাটিয়েছেন পাঁচ রাত। তপশ্চর্যার সময় তিনি বজ্রভূমি ও শুভভূমির অনেক জায়গা ঘুরে বেড়ান। অনেক সময় গ্রামের লোকেরা তাঁকে আক্রমণ করেছে, তাঁর ওপর কুকুর লেলিয়ে দিয়েছে। এমন হয়েছে যে, তিনি ধ্যানে বসেছেন, ক্রুদ্ধ গ্রামবাসীরা তাঁর শরীরের মাংস কেটে নিয়েছে, চুল টেনে ছিঁড়ে ফেলেছে, কী ধুলোবালি দিয়ে শরীর ঢেকে দিয়েছে। কিন্তু তিনি বীরের মত সব অত্যাচার সহ্য করেছেন, সব বাধা-বিপত্তি মোকাবেলা করেছেন, এজন্যে তিনি মহাবীর।

তপশ্চর্যা শুরুর বারো বছর পাঁচ মাস পনেরোদিন পর বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে রিজুবালুকা (বর্তমানে বরাকর নদী)-র তীরে জামুই গ্রামের এক বিশাল শাল গাছের নীচে মহাবীর শুক্ল বসনে ধ্যানে বসেছেন, সারাদিন খরতাপ বর্ষণ করে সন্ধ্যায় অস্তমান সূর্যদেব তাঁর শরীরে প্রবিষ্ট হলেন, জ্ঞানের আলোকশিখায় তিনি আলোকিত হলেন, হয়ে উঠলেন সর্বজ্ঞ, হয়ে উঠলেন অরিহন্ত। তিনি হলেন জিনা– আকর্ষণ বিকর্ষণহীন নিরালম্ব পুণ্যবান ব্যক্তি। তখন তাঁর বয়স বিয়াল্লিশ।

এরপর মহাবীর মানুষের আধ্যাত্মিক মুক্তির সারসত্য প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ভারতবর্ষের সর্বত্র নগ্নপদে, নগ্নদেহে ক্ষুধা-তৃষ্ণা উপেক্ষা করে সবাইকে সত্যের বাণী শুনিয়েছেন। দিওয়ালীর দিন পওয়াপুরী অঞ্চলে বাহাত্তর বছর সাড়ে চারমাস বয়সে মহাবীর নির্বাণ লাভ করেন। জৈন ধর্মাবলম্বীরা এই দিনটি তাঁর মোক্ষ বা মুক্তিলাভের দিন হিসেবে উদ্‌যাপন করে থাকেন।

মহাবীরের দর্শনের আটটি অত্যাবশ্যকীয় নীতি– এর তিনটি অধিবিদ্যাবিষয়ক, পাঁচটি নীতিসংক্রান্ত। এগুলি পালনে শুদ্ধ জীবনযাপন করা সম্ভব বলে জৈনরা বিশ্বাস করেন। মহাবীর প্রচার করেন যে, জন্মের সময় থেকেই প্রত্যেকটি জীবিত বস্তু (আত্মা) ভাল বা মন্দ দুই ধরনের কর্ম-অণুর বন্ধনে আবদ্ধ। কর্মের প্ররোচনায় প্রত্যেকে পার্থিব সুখ-শান্তি-সমৃদ্ধি খোঁজে যা আত্মকেন্দ্রিক ভাবনা ও কর্মের এবং যাবতীয় লোভ-লালসা-ক্রোধ-ঘৃণার কারণ। এইসব কিছু মিলেই কর্ম। কাজেই এই কর্মের নিগড় থেকে মুক্ত হতে মহাবীর সম্যক দর্শন, সম্যক জ্ঞান ও সম্যক চরিত্রের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। সম্যক চরিত্রগঠনে পাঁচটি প্রতিজ্ঞা প্রয়োজন– যথা অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (পরস্বাপহরণ না করা), ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ। আবার নিরাকার দর্শন ও আপেক্ষিকতার সূত্র না জানলে এই প্রতিজ্ঞার পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। সাধু-সন্ন্যাসীরাই কেবল এই প্রতিজ্ঞা পালন করতে পারেন, সংসারী লোকেরা যিনি যতটুকু পারেন পালন করবেন। মহাবীর বলেন, নারী ও পুরুষ উভয়েই একই আধ্যাত্মিক শক্তির অধিকারী– উভয়েরই মোক্ষ বা অনন্ত সুখের সন্ধানে ব্যাপৃত হওয়া উচিত। মহাবীর তাঁর অনুসারীদের চার ভাগে ভাগ করেন– সাধু, সাধ্বী, শ্রবক ও শ্রবিকা। শ্রবক-শ্রবিকা সাধারণ নর-নারী। এই শ্রেণীকরণকে বলা হয় চতুর্বিধ জৈন সংঘ।

মহাবীরের প্রত্যক্ষ শিষ্যদের বলা হয় জৈন অগম (গণধারা)। সময়ের সরণী বেয়ে এই অগমসূত্র হারিয়ে গেছে, নষ্ট বা পরিবর্তিত হয়েছে। প্রায় এক হাজার বছর পর অগমসূত্রগুলি তালপাতায় লিপিবদ্ধ করা হয়। শ্বেতাম্বররা এই সূত্রগুলিকে অভ্রান্ত বলে মানেন, অপরদিকে দিগম্বরেরা এগুলিকে নজির হিসেবে ব্যবহার করেন।

মহাবীরের আগেও জৈন ধর্ম ছিল। কাজেই তাঁর শিক্ষা পূর্বসূরীদের পদাঙ্ক অনুসারে হয়েছে। মহাবীর কোন নতুন ধর্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠা করেননি, তিনি বিদ্যমান ধর্মেরই সংস্কারসাধন ও প্রচার করেছেন। মহাবীর তাঁর পূর্ববর্তী তীর্থঙ্কর পরশ্বর প্রতিষ্ঠিত ধর্মমত অনুসরণ করেছেন। মহাবীর জন্মের পূর্বে আরো ছাব্বিশ তীর্থঙ্কর অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন বলে জৈন ধর্মগ্রন্থ ত্রিস্বস্তিসলকপুরুষ চরিত্র ও উত্তরপুরাণে বর্ণিত হয়েছে।

মহাবীরের নির্বাণের পর শতাব্দীর পর শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়েছে, ধর্মীয় মতবাদ জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে। ধর্মমতেও নানা মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে, তবে মহাবীরের মূল মতবাদে কোন প্রভাব পড়েনি। এখন দেখা যায় জৈনরা মহাবীর ও অন্যান্য তীর্থঙ্করদের মূর্তি সিংহাসনে বসিয়ে হিন্দুদের মত প্রার্থনা করছেন।

● নিজস্ব প্রতিবেদন

উপরে
১. আইজিসিসি ধানমন্ডি মিলনায়তনে ফ্যাকাল্টি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সস্ত্রীক ভারতীয় হাই কমিশনার ও ডেপুটি হাই কমিশনার
২. ১৬ মার্চ ২০১৬ জগদীশচন্দ্র বসু ট্রাস্ট-এর প্রতিনিধিদের সঙ্গে হাই কমিশনার ও দূতাবাসের অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ

নিচে ॥ ১. ১২ মার্চ ২০১৬ আইজিসিসি গুলশান কেন্দ্রে ভারতের রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী ইমন চক্রবর্তী এবং বাংলাদেশের আবৃত্তিশিল্পী সামিউল ইসলাম পোলাকের গান ও কবিতা পরিবেশন ২. ২৩ মার্চ ২০১৬ আইজিসিসি গুলশান কেন্দ্রে *পূর্ণ চাঁদের মায়ায়* শীর্ষক রবীন্দ্রসংগীত সন্ধ্যায় তিন শিল্পীর সংগীত পরিবেশন ৩. ২৫ মার্চ ২০১৬ আইজিসিসি গুলশান কেন্দ্রে বিশিষ্ট কবি সৈয়দ শামসুল হকের কবিতাসন্ধ্যা ৪. আইজিসিসি-র ৬ষ্ঠ প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সাড়ম্বর উদ্‌যাপন

Regd. No. DA 355 Bharat Bichitra April 2016

সত্যমেব জয়তে

ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা

জ্ঞাতব্য তথ্য

নতুন আইভিএসি কেন্দ্র

ইন্ডিয়ান ভিসা অ্যাপলিকেশন সেন্টার (আইভিএসি)-এর মাধ্যমে ভারতীয় ভিসা আবেদন গ্রহণের জন্য ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকার স্বীকৃত এজেন্ট এস্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (এসবিআই) আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা দিচ্ছে যে, এখন থেকে ভিসার আবেদনপত্র গ্রহণ ও বিতরণের জন্য ঢাকার উত্তরাসহ বরিশাল, ময়মনসিংহ ও রংপুরে নতুন আইভিএসি খোলা হয়েছে।

কার্যক্রমকাল

রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার– আবেদনপত্র গ্রহণ সকাল ৮.০০টা থেকে দুপুর ১.০০টা।
রবিবার থেকে বৃহস্পতিবার– আবেদনপত্র বিতরণ বিকাল ৩.০০টা থেকে সন্ধ্যা ৬.০০টা।

ঠিকানা

আইভিএসি-র সব কেন্দ্রে সব ধরনের ভিসা আবেদন গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশে এখন নিম্নোক্ত আইভিএসি কেন্দ্রে বিদ্যমান। এগুলো হচ্ছে: আইভিএসি, গুলশান, ঢাকা ॥ আইভিএসি, মতিঝিল, ঢাকা ॥ আইভিএসি, ধানমন্ডি, ঢাকা ॥ আইভিএসি, উত্তরা, ঢাকা ॥ আইভিএসি, চট্টগ্রাম ॥ আইভিএসি, সিলেট ॥ আইভিএসি, খুলনা ॥ আইভিএসি, রাজশাহী ॥ আইভিএসি, বরিশাল নর্থ সিটি সুপার মার্কেট দ্বিতীয় তলা, বরিশাল সিটি কর্পোরেশন, অমৃতলাল দে রোড, বরিশাল (এলাকা: বরিশাল, বরগুনা, ভোলা, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী ও পিরোজপুর) ॥ আইভিএসি, ময়মনসিংহ, ২৯৭/১ মাসকান্দা দ্বিতীয় তলা, মাসকান্দা বাসস্ট্যান্ড, ময়মনসিংহ (এলাকা: জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা, শেরপুর, টাঙ্গাইল ও ভালুকা) ॥ আইভিএসি, রংপুর, জে বি সেন রোড, রামকৃষ্ণ মিশনের বিপরীতে, মহিগঞ্জ, রংপুর (এলাকা: রংপুর, দিনাজপুর, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী, পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও এবং লালমনিরহাট)। উল্লেখ্য, ঢাকার বাইরের এলাকার ভিসা আবেদন ঢাকার কোন কেন্দ্রে গ্রহণ করা হবে না।

ভিসা আবেদন করার সময় আবেদনকারীদের সঠিক বিভাগ নির্ধারণ করে আবেদন করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। সব দলিল সঠিক, সম্পূর্ণ ও অবিকল হওয়া চাই। আবেদনকারীদের এজেন্ট ও মধ্যবর্তী মানুষদের ব্যাপারে সতর্ক থাকার এবং এসব ক্ষেত্রে নিকটতম থানা/আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে জানানোর পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। আইভিএসি বাংলাদেশে তার পক্ষে কাজ করার জন্য কোন ব্যক্তি/সংস্থাকে অনুমোদন দেয়নি।

পুনর্নির্ধারিত প্রক্রিয়া ফি

১ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে পুনর্নির্ধারিত ভিসা প্রক্রিয়া ফি নিম্নোক্ত হারে কার্যকর হবে: ১. ঢাকার সব আইভিএসি কেন্দ্র– বাংলাদেশী টাকা ৬০০.০০। ২. আইভিএসি, চট্টগ্রাম– বাংলাদেশী টাকা ৬০০.০০ ॥ ৩. আইভিএসি, রাজশাহী– বাংলাদেশী টাকা ৬০০.০০ ॥ ৪. আইভিএসি, সিলেট– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০ ॥ ৫. আইভিএসি, খুলনা– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০ ॥ ৬. আইভিএসি, বরিশাল– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০ ৭. আইভিএসি, ময়মনসিংহ– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০ ॥ ৩. আইভিএসি, রংপুর– বাংলাদেশী টাকা ৭০০.০০।

আলোকচিত্র আপলোডের নতুন পদ্ধতি:

আবেদনকারীদের অনলাইন আবেদনপত্রে দেওয়া নির্ধারিত জায়গায় তাদের আলোকচিত্র স্ক্যান করে আপলোড করতে হবে। স্ক্যানকৃত আলোকচিত্র ছাড়া আবেদনপত্র অসম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে।

হেল্পলাইনসমূহ

হেল্পলাইন টেলিফোন/ফ্যাক্স/ ই-মেইলসমূহ: ০০-৮৮-০২ ৮৮৩৩৬৩২২ ॥ ০০-৮৮-০২ ৯৮৯৩০০৬ ॥ ০০-৮৮-০১৭১৩ ৩৮৯৪৯৯ ০০-৮৮-০২ ৯৮৬৩২২৯ (ফ্যাক্স) ॥ visahelp@ivacbd.com. আরো সাহায্যের জন্য ই-মেইল: visahelp@hcidhaka.gov.in
ভিসা আবেদন প্রক্রিয়া সংক্রান্ত যে-কোন ধরনের প্রশ্নের জবাব পেতে ভিজিট করুন: http://www.ivacbd.com/faq.php

জনস্বার্থে ভারতীয় হাই কমিশন, ঢাকা কর্তৃক প্রচারিত